কৃষক আন্দোলন (১৯১৯-৩৯)

কৃষক বিদ্রোহ (১৯১৯—৩৯) ঃ গান্ধীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহের চরিত্রগত পরিবর্তন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব—আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য—কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা—অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের প্রভাবে কৃষক বিদ্রোহ—যুক্তপ্রদেশ ঃ বাবা রামচন্দ্রের আন্দোলন—মাদারী পাশীর একতা বা একা আন্দোলন—বিহারে স্বামী বিদ্যানন্দের আন্দোলন—রাজস্থান—দক্ষিণ ভারতঃ রাজুর রাম্পা বিদ্রোহ—মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ—গুজরাট ঃ বারদোলি কৃষক আন্দোলন—বাংলার কৃষক আন্দোলন—১৯৩০-এর দশকে কৃষক আন্দোলনের পিছনে দুটি প্রভাব—বিশ্বব্যাপী মন্দা ও আইন অমান্য আন্দোলন—গুজরাট—যুক্তপ্রদেশ—ভারতের অন্যান্য অঞ্চল—বাংলা—কিষাণ সভা আন্দোলন ও সর্বভারতীয় কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা—১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন ও কৃষক আন্দোলন—দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—গান্ধীর ভূমিকা—কৃষক বিদ্রোহে কমিউনিষ্টদের অবদান—কৃষক বিদ্রোহের ফল।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ইংরেজ শাসন মেনে নিলেও, ভারতের নিম্নবর্গের মানুষ, বিশেষতঃ কৃষক সম্প্রদায়, গোড়া থেকেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল কৃষকদের যারা নানা ভাবে শোষণ করতো, অর্থাৎ জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর প্রতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। তারা ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের কোন প্রতিকারই সরকার করতো না; বরং সরকার সব সময়েই থাকতো শোষক শ্রেণীর পক্ষে। অর্থাৎ সরকারের কাছে তারা চাইতো তাদের অভ'ব অভিযোগের প্রতি শাসক শ্রেণীর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি। ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করে শাসন ক্ষমতা দখলের কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না, বা সে ধরনের আকাশ কুসুম স্বপ্ন তারা দেখতো না। একই ভাবে ভারতে শিল্প বিকাশের ফলে যখন শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলো, তখন তারাও চেয়েছিল তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে মজুরি বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন অন্যায় অবিচার ও শোষণের প্রতিকার। এই বিষয়ে তাদের কাছে দেশীয় শিল্পপতি ও বিদেশী শিল্পপতিদের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হ'লে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে, এই ধরনের স্বপ্ন হয়তো তারা দেখতো। কিন্তু তারাও কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা জাতীয়তাবাদের মত মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কথা চিন্তা অন্ততঃ প্রথম দিকে করে নি। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ভারতের পুঁজিপতি শিল্পপতিদের আন্দোলনের সঙ্গে তাদের আন্দোলনের অনেক তফাৎ ছিল।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও আরও কিছুটা পরে ভারতের পুঁজিপতি শিল্পপতি শ্রেণীর ব্রিটিশ বিরোধিতা একটা সুস্পষ্ট সাংগঠনিক রূপ পেল, তখন তারা আবেদন নিবেদন নীতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে সব অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা

Scanned with CamScanner

করেছিল ও দাবী দাওয়া পেশ করেছিল, তার সঙ্গে ভারতের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কোন সম্পর্ক বা স্বার্থ ছিল না। কংগ্রেস ছিল উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্গের প্রতিষ্ঠান। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সেখানে ঠাঁই হয় নি। আসলে একই দেশের মানুষ হলেও উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। এ কথা স্বীকার্য যে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের দারিদ্র এবং ক্ষোভ ও অসন্তোষের কথা পুরোপুরি বিস্মৃত হয় নি। দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সি.শঙ্করণ নায়ার, ওয়াচা, আর. এম. সয়ানী প্রমুখ নেতা এ নিয়ে অনেক লেখালিখি করেছেন, এবং ইংরেজ শাসনের কড়া সমালোচনা করেছেন। সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কংগ্রেস কিছু সুপারিশও করেছিল। কিন্তু শ্রমিক কৃষকের জীবনের শরিক তাঁরা হতে পারেন নি। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে তাঁরা নিয়মমাফিক কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তিলক ছিলেন উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। আসলে শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থে কিছু করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই তা কংগ্রেস কর্মকর্তাদের স্বার্থে আঘাত করার সম্ভাবনা ছিল। শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই অনতিক্রম্য ছিল। কংগ্রেস কোনদিনই এই সংকট পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

উভয় পক্ষের এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থবহ হ'য়ে উঠতে পারছিল না; পরিপূর্ণতা পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অবস্থাটা বদলে গেল গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাইকে সামিল করতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কোন আন্দোলন সফল হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিককে বাইরে রেখে সংখ্যালঘু মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতি পুঁজিপতিদের সংগ্রাম তার গতি হারিয়ে ফেলবে। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক বৃহত্তর ও মহত্তর ব্যাপ্তি দিলেন। ইংরেজ বিতাড়নই তাঁর সংগ্রামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তিনি চাইলেন ভারতের গ্রামীণ পুণর্গঠন ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি। সাধারণ মানুষের সামনে তিনি তুলে ধরলেন রামরাজ্যের স্বপ্ন। এই ভাবে তিনি সাধারণ মানুষকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় অবদান। কিন্তু গান্ধীর মতাদর্শে শ্রেণী সংগ্রামের কোন স্থান ছিল না। মার্কসবাদীদের মত তিনি সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর চান নি। জমিদার-কৃষক বা মালিক-শ্রমিক বিরোধে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর আদর্শ ছিল পারস্পরিক সহাবস্থান অর্থাৎ এক পক্ষকে বাদ দিয়ে অন্য পক্ষের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তিনি মনে করতেন ভারতের জনগণের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা আর সেই লক্ষ্যে উপনীত হ'তে হলে সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করতে হবে। গান্ধীর সম্মোহিনী ব্যক্তিত্ব সাধারণ মানুষের মন জয় করেছিল। তাঁর ডাকে সাড়া দিতে সাধারণ মানুষ দেরী করে নি। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে মেলাতে পারলেও তাতে সাধারণ মানুষের অবস্থার কতটুকু উন্নতি হ'য়েছিল, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গকে যে ঐক্যের বন্ধনে গান্ধী আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তা ছিল অনেকাংশে অবাস্তব ও কৃত্রিম। ধানাগড়ের ভাষায়— "The alliance between the peasantry and the Indian bourgeoisie that Gandhi established was inherently weak."[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের কৃষক বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার সঙ্গে মিশে যাওয়ায় এর চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। এর আগে যে সমস্ত কৃষক

Scanned with CamScanner

বিদ্রোহ হ'য়েছিল, তার প্রভাব কৃষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব ও সংগঠন ছিল তাদের হাতেই। সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে মাথা ঘামাতো না। তবে কৃষক বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করলে এবং জীবন ও ধন সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তারা এর বিরোধিতা করতো। নীল বিদ্রোহ ছাড়া ভারতের কৃষক বিদ্রোহ কদাচিৎ মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য উচ্চ সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেছিল। ১৯২০-এর দশকের পর থেকে দেখা গেল কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসছেন কৃষক সম্প্রদায় বহির্ভূত আদর্শবাদী কিছু মানুষ। এঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল প্রশ্নাতীত। লক্ষ্যনীয় জহরলাল নেহেরুর মত নেতা, যাঁর জন্ম হ'য়েছিল উচ্চ বংশ ও পরিবারে, কৃষকদের বাস্তব সমস্যা ও শোষণ সম্পর্কে যাঁর সামান্যতম অভিজ্ঞতা ছিল না, কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য ও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উত্তর ভারতের পল্লীতে তিনি কিছুদিন বাস করেছিলেন। গুজরাটে বল্লভভাই প্যাটেলও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হ'য়েছিলেন। জহরলাল বা প্যাটেলের মত বড় মাপের নেতা ছাড়াও অনেক আঞ্চলিক নেতার আবির্ভাব হ'য়েছিল, যাঁরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন এবং তাঁদের আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী ছিলেন। গান্ধীর উপস্থিতিও কৃষকদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতো। তবে সব ক্ষেত্রেই কৃষকেরা বাইরের নেতার নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল না। তাদের মধ্যে, বিশেষতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে, এমন কিছু নেতা ছিলেন, যাঁরা কৃষকদের কাছে দাবী করতেন অখণ্ড আনুগত্য। তাঁরা প্রচার করতেন যে, তাঁরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই ঈশ্বর তাঁদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা কৃষকদের সামনে তুলে ধরতেন উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের ছবি। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, তাঁরা ফিরিয়ে আনবেন অতীতের সুবর্ণময় দিনগুলি, প্রতিষ্ঠিত করবেন শোষণমুক্ত এক সমাজ। এই ধরনের নেতৃত্বে অবশ্য অহিংসার কোন স্থান ছিল না। বরং তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যই কৃষকদের উৎসাহিত করতেন এবং অনেক সময় অভয় দিয়ে বলতেন, ইংরেজদের গোলাগুলিতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই; তাঁদের ঐশ্বরিক প্রভাবে ইংরেজদের বন্দুকের নল থেকে গোলাগুলির বদলে বার হবে জল। এই ধরনের আন্দোলনকে সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'millennial' এবং 'Messianic' আন্দোলন বলা হয়। শুধু আদিবাসী কৃষকদের কাছেই নয়, অন্যান্য কৃষকদের কাছেও গান্ধী আবির্ভূত হ'য়েছিলেন একজন Messiah বা পরিত্রাতা হিসাবে। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে প্রবল আবেগ, উত্তেজনা এবং অবশ্যই অনুপ্রেরণার সঞ্চার হ'য়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কৃষক আন্দোলনে যে জোয়ার এসেছিল, তার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিষাণ সভা গড়ে উঠেছিল এবং এই সব কিষাণ সভার মাধ্যমে কৃষক আন্দোলন একটি সুস্পষ্ট ও সুসংগঠিত রূপ পায়। এই বিষয়ে উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন যুক্তপ্রদেশের হোমরুল লীগের কয়েকজন উৎসাহী ও তৎপর সদস্য। কংগ্রেস নেতারাও কিষাণ সভা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু কৃষক আন্দোলনে পথিকৃৎ বিভিন্ন কংগ্রেস নেতা কৃষকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসলেও এবং তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল হ'লেও কংগ্রেস কখনও তাদের মূল সমস্যা ও অভাব অভিযোগের প্রতিকার করতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়

নি। কংগ্রেস কখনও জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করে নি। আসলে কংগ্রেসের পক্ষে জমিদার বিরোধী কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব ছিল না, কারণ জমিদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য বা সমর্থক। কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে জমিদারদের চটানোর কোন প্রশ্ন ছিল না। এই কারণেই কংগ্রেস কৃষকদের কর বয়কট আন্দোলন সমর্থন করে নি। রায়তওয়ারী এলাকায় অবশ্য কংগ্রেসের এই ধরনের আন্দোলনে আপত্তি করে নি। যাই হোক ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মদনমোহন মালব্যের সমর্থনে এবং গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও ইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদীর তৎপরতায় যুক্তপ্রদেশ কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত প্রদেশে এই আন্দোলন যথেষ্ট জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং ১৯১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে এই প্রদেশের ১৭৩টি তহশিলে অন্ততঃ ৪৫০টি শাখা কার্যালয় স্থাপিত হ'য়েছিল। কৃষকদের মধ্যে এই সময়ে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ১৯১৮ সালে দিল্লীতে এবং ১৯১৯ সালে অমৃতসরে আহুত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে বহু কৃষক প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

১৯২০র দশকের গোড়ায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল, কৃষকদেরও তা স্পর্শ করেছিল। গ্রাম পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সম্পর্কে গান্ধী সব সময়েই উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন। তিনি চাইতেন চরকা ও খাদি আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রামবাসীরা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করুক। অস্পৃশ্যতা ও মদ্যপানের বিরুদ্ধেও তিনি সরব ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। ১৯২০-২১ সালে যুক্ত প্রদেশের প্রতাপগড়, রায় বেরিলী, সুলতানপুর এবং ফৈজাবাদ জেলায় কিষাণ সভাগুলির নেতৃত্বে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, মাজিদ সিদ্দিকি ও কপিলকুমার তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অযোধ্যা অঞ্চলে তালুকদাররা তাদের প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। করের বোঝা ছিল দুর্বহ। ১৮৮৬ সালের অযোধ্যা কর আইনে প্রজাদের যেটুকু সুবিধা দেয়া হ'য়েছিল, তা প্রজাদের এক প্রকার কোন কাজেই আসে নি। তালুকদারেরা আইন এড়িয়ে অবৈধভাবে নজরানা আদায় করতো। জমি বেদখল, বেগার প্রভৃতি অত্যাচার ছিল প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। কিষাণ সভাগুলি এই সব শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। রায়বেরিলি-প্রতাপগড় অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন ঝিঙ্গুড়ি সিং ও দুর্গাপাল সিং নামে স্থানীয় দুই কৃষক নেতা। তবে বাবা রামচন্দ্র নামে একজন সন্ন্যাসী যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলনে এক নতুন গতির সঞ্চার করেন। মহারাষ্ট্রবাসী এই ব্রাহ্মণ ১৩ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে ফিজি দ্বীপে শ্রমিক জীবন যাপন করার পর ১৯০৯ সালে যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদে আসেন। সন্ন্যাসী এই মানুষটি এর পর এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে রামায়ণ গান পরিবেশন করতেন। ১৯২০ সালের জুন মাসে তিনি জৌনপুর ও প্রতাপগড় থেকে কয়েকজন কৃষককে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদে গৌরীশংকর মিশ্র ও জহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরই অনুরোধে জহরলাল কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে রাত কাটান। ধর্মীয় আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বাবা রামচন্দ্র জাতপাতের জিগিরও তোলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি 'কুর্মী-ক্ষত্রিয় সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জোরজবস্তি কর আদায় বন্ধ করা বা করের পরিমাণ হ্রাস করা, বেগার প্রথার অবসান, বেদখলী জমি চাষ করতে অস্বীকার করা, অত্যাচারী ভূস্বামীদের সামাজিক বয়কট ইত্যাদি। তালুকদাররা অবশ্যই এই কৃষক আন্দোলন সুনজরে দেখে নি।

Scanned with CamScanner

এদিকে বাবা রামচন্দ্রকে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করায় প্রতাপগড় জেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চার-পাঁচ হাজার কৃষক জমায়েত হয়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ফেরৎ পাঠানো হয়। এই সময় একটা গুজব রটে যায় যে, বাবা রামচন্দ্রের মুক্তির জন্য স্বয়ং গান্ধী আসছেন। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে চরম উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। প্রায় ৬০,০০০ কৃষক জমায়েত হয়। এই পরিস্থিতিতে ভীত হ'য়ে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন এবং বাবা রামচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যুক্ত প্রদেশ কিষাণ সভা ভেঙ্গে যায় এবং ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে প্রতাপগড়ে অযোধ্যা কিষাণ সভা নামে একটি পাল্টা কিষাণ সভা স্থাপিত হয়। জহরলাল নেহেরু, মাতা বাদল পাণ্ডে, বাবা রামচন্দ্র মিশ্র, দেও নারায়ণ পাণ্ডে, কেদারনাথ প্রভৃতি নেতা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের তৎপরতায় ৩৩০টি কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে অযোধ্যা কিষাণ সভা অযোধ্যায় যে বিশাল সমাবেশ আহ্বান করেছিল তাতে প্রায় এক লক্ষ কৃষক যোগ দেয়। কিষাণ সভা আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রতিষ্ঠানে উচুঁ ও নীচু—উভয় জাতের কৃষকেরই ঠাঁই হ'য়েছিল।

যুক্তপ্রদেশের কিষাণ সভা আন্দোলন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকে নি। কৃষকেরা তালুকদারদের বাড়ী ও খামার আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয় নি; তারা দোকান বাজারও লুঠপাট করে। কোন কোন অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। এই ধরনের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনে কোনদিন কংগ্রেসের সায় ছিল না। বস্তুতঃ এই সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় এলাকার সাধু, সন্ন্যাসী এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ কিছু মানুষ। সরকারকে অবশ্য এই আন্দোলন দমন করতে খুব বেগ পেতে হয় নি। ব্যাপক ধরপাকড় করে ও লাঠিগুলি চালিয়ে এই আন্দোলন ধ্বংস করা হয়। সরকার অবশ্য সংশোধিত অযোধ্যা আইন তৈরী করে প্রজাদের ক্ষোভের কিছুটা উপশম করার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে প্রজারা খুব বেশি উপকৃত না হ'লেও, তাদের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার হ'য়েছিল।

১৯২১ সালের শেষ দিকে ও ১৯২২ সালের গোড়ায় যুক্তপ্রদেশের হরদৈ, বারাবাঁকি, সীতাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আর একটি কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহ "একতা" বা "একা" বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এই সব এলাকায় কৃষকদের ক্ষোভের কারণ ছিল নথিবদ্ধ করের উপর আরও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কর আদায়, কর আদায়কারী ঠিকাদারদের অত্যাচার ইত্যাদি। কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতারা এই আন্দোলনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একতা বা একা সমাবেশে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকেরা শপথ করেছিল যে, তারা যথা সময়ে কর প্রদান করবে, কিন্তু নথিবদ্ধ করের বেশি কিছু দেবে না, জমি থেকে উৎখাত করলেও তারা জমি ছেড়ে চলে যাবে না। বেগার শ্রম দেবে না, অপরাধীদের কোনভাবে সাহায্য করবে না এবং পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত সব সময়ে মেনে নেবে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মাদারী পাশী নামে এক চরমপন্থী নেতা। এই আন্দোলনও শান্তিপূর্ণ থাকে নি। কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতাদের শান্তিপূর্ণ অহিংস সংগ্রাম কৃষকেরা সমর্থন করে নি। কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতারা এর ফলে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। ১৯২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরকার চরম দমন নীতি প্রয়োগ করে এই আন্দোলন ধ্বংস করে দেন। মাদারী পাশী কারারুদ্ধ হন। এইভাবে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯-২০ সালে বিহারে দ্বারভাঙ্গা রাজের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত হ'য়েছিল। এই বিদ্রোহ দ্বারভাঙ্গা, মুজঃফরপুর,

ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও মুঙ্গের জেলা জুড়ে সংগঠিত হ'য়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এই সব অঞ্চলের কৃষকেরা এমনিতেই খুব ক্ষুব্ধ ছিল। তার উপর দ্বারভাঙ্গা রাজের অত্যাচার এদের মরিয়া করেছিল। দ্বারভাঙ্গা রাজ পুরানো গো-চারণ ভূমি ও গাছের উপর কর দাবী করায় কৃষকেরা আপত্তি জানায়। আমলা বা ছোট জমিদাররাও অন্যায়ভাবে নানা কর দাবী করতো। এই অবস্থায় ১৯১৯ সালের গরম কালে কৃষকেরা প্রতিবাদী সমাবেশে মিলিত হতে থাকে। কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন বিশুবরণ প্রসাদ নামে একজন সম্পন্ন কৃষক। এঁর বাড়ী ছিল শরণ জেলায়। ইনি গান্ধীর চম্পারণ কৃষক বিদ্রোহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেকে গান্ধীর শিষ্য বলে দাবী করতেন। ইনি স্বামী বিদ্যানন্দ নাম ধারণ করে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এই বিদ্রোহ প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণ থাকলেও দু-একটা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে থাকে। কোন কোন অঞ্চলে জোর করে গাছ কেটে নেয়া হয়। কোঠিয়া দেমাই নামে একটি অঞ্চলে বিদ্যানন্দের ডাকা কৃষক সমাবেশ ভাঙ্গার জন্য জনৈক নীলকর লাঠিয়ালদের নিযুক্ত করেন। এদিকে দ্বারভাঙ্গা রাজ এই আন্দোলন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিভেদ নীতি অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষকদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দান করেন। স্বয়ং স্বামী বিদ্যানন্দ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসও অনেকাংশে দায়ী ছিল। এই বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য স্বামী বিদ্যানন্দ কংগ্রেসের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর আবেদনে সাড়া দেয় নি। এর ফলে দ্বারভাঙ্গা রাজের সুবিধা হয়। স্বামী বিদ্যানন্দের ডাকা সমাবেশে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, হাসান ইমাম, মাঝারুল হক প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা যোগ দেন নি।

১৯২০-২১ সালে রাজস্থানের পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। এখানে কিছু উগ্রপন্থী নেতা বৈপ্লবিক মতাদর্শ (যেমন জমির মালিক কৃষক, সরকার বা জমিদার নয়) প্রচার করে কৃষকদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করছিলেন। উইলকিনসনের রাজস্থান এজেন্সী রিপোর্টে (১৯২১) মেবারকে এক উপদ্রুত এলাকা বলে চিহ্নিত করা হ'য়েছিল। যাই হোক বিদোলিয়া অঞ্চলে বিজয় সিং পথিক এবং মানিকলাল বর্মা নামে দু-জন নেতা এক জোরদার কিষাণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ১৯২২ সালে জাগিরদাররা প্রজাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। এদিকে মতিলাল তেজাওয়াত নামে উদয়পুরের এক মশলা ব্যবসায়ী নিজেকে গান্ধীর দূত বলে ঘোষণা করে মেবারের ভিল উপজাতিদের সংগঠিত করতে তৎপর হন। অন্যদিকে মেবারে জয় নারায়ণ ব্যাস নামে আর একজন নেতা কর বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উদয়পুরের মহারাণার বিরুদ্ধে এই সব আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। কংগ্রেস মেবার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অগ্রসর হলে মদনমোহন মালব্য হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বলেন যে, উদয়পুরের মহারাণা তাঁর বন্ধু এবং তিনি যাতে প্রজাদের স্বার্থে কিছু সুযোগ সুবিধা দান করেন, তার জন্য মালব্য তাঁকে অনুরোধ করবেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলেও জোরদার কৃষক আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল। গুন্টুর জেলায় কৃষকেরা কর দেয়া বন্ধ করে, যার ফলে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ অনেক কমে যায়। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর হস্তক্ষেপে অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতারা এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তবে অন্ধ্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ভয়াবহ কৃষক বিদ্রোহ হ'লো উত্তর গোদাবরীতে আল্লুরী শ্রীরামরাজুর নেতৃত্বে রাম্পা বিদ্রোহ (১৯২২-২৪)। কোয়া ও রেড্ডিদের এই আদিবাসী কৃষক

Scanned with CamScanner

বিদ্রোহ ছিল প্রত্যক্ষভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন। সাঁওতাল, মুণ্ডা, গোণ্ড, ভিল প্রভৃতি আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল মহাজনী শোষণ ও জমিদারী অত্যাচার। কিন্তু রাজু পরিচালিত রাম্পা বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা তৈরী ও অন্যান্য গঠনমূলক পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য আদিবাসীদের শ্রম দান করতে বাধ্য করার সরকারী প্রচেষ্টা। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। ব্যাস্টিয়ন (Bastion) নামে ওডেমের জনৈক ইংরেজ তহশিলদার বল প্রয়োগ করে রাস্তা তৈরীর কাজে আদিবাসীদের নিযুক্ত করতে চেষ্টা করেন। মহাজনী শোষণ এবং আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ দীর্ঘদিন ধরেই কৃষকদের উত্তেজিত করছিল। এই অবস্থায় জোরজবস্তি বেগার শ্রমদান কৃষকদের বেপরোয়া করে তোলে। শুরু হয় রাম্পা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নায়ক রাজু কিন্তু সিধু-কানু বা বীরসা মুণ্ডার মত আদিবাসী সন্তান ছিলেন না। ১৮৯৭ সালে এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হ'য়েছিল। তিনি স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন না। বিভিন্ন স্থান ঘুরতে ঘুরতে তিনি উত্তর গোদাবরী অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন। আদিবাসী কৃষকদের উপর শোষণ ও অত্যাচার তাঁর মনকে ব্যথিত করেছিল। নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা রাজুর ছিল। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং দক্ষতা ছিল তারিফ করার মত। তিনি যোগ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন গান্ধীর গুণমুগ্ধ ভক্ত এবং স্বাভাবিক ভাবেই গান্ধী নীতিতে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল। আবার তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেও দাবী করতেন। তিনি নিজেকে 'কল্কি' অবতার বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুতঃ তাঁর আন্দোলন millennial রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। তিনি যখন এই আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি ভাবতে পারেন নি যে, তা এক ব্যাপক রূপ গ্রহণ করবে বা তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে। কিন্তু সরকারী দমন নীতি সত্ত্বেও ভদ্রাচলম্ থেকে পার্বতীপুরম্ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় গান্ধীবাদী রাজু বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে গেলে সব সময় শান্তিপূর্ণ ও অহিংস নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। তিনি গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করে ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। বস্তুতঃ আন্দোলনের শেষ পর্বে তিনি হিংসার পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হন। হাজার হাজার আদিবাসী কৃষককে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে তাঁর এই সংগ্রামে বিপক্ষ দলের কোন ভারতীয় সেনা যাতে নিহত বা আহত না হয়, সেদিকে তাঁর নজর ছিল। ১৯২৪ সালের ৬ই মে রাজু ধরা পড়েন এবং তিনি নাকি পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর রাম্পা আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে এবং সেপ্টেম্বর মাসে এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাঁর আন্দোলনকে দমন করতে সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'য়েছিল এবং এর জন্য মাদ্রাজ সরকারকে ১৫লক্ষ টাকা খরচ করতে হ'য়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে ব্যাপক ও ভয়াবহ আকারের millennial আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কেরল অঞ্চলের মালাবার জেলা। মালাবারের মোপলা কৃষকদের সংগ্রামী মনোভাবের ঐতিহ্য আমরা উনিশ শতকেও প্রত্যক্ষ করেছি। জমিদারী শোষণ এখানকার কৃষকদের মরিয়া করেছিল। ১৯২১ সালে মোপলা বিদ্রোহের ঠিক আগে মালাবারে তিনটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। এই তিনটি আন্দোলন যুক্ত হ'য়ে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

প্রথমতঃ ১৯১৬ সাল থেকে জমিতে কৃষকদের অধিকার নিয়ে একটা আন্দোলন ক্রমশঃ দানা পাকিয়ে উঠছিল। ঐ বছর প্রথম Malabar Tenants Association প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৭ সালে ত্রিবাঙ্কুরে এবং ১৯১৪ সালে কোচিনে জমিতে কৃষকদের অধিকার স্বীকৃত হলেও, মালাবারে সেই অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় কৃষকেরা খুব ক্ষুব্ধ ছিল। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে মানজেরীতে মালাবার জেলা কংগ্রেসের অধিবেশনে কৃষকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং এর জন্য আইন তৈরী করার সুপারিশ করা হয়। এ ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর আগে প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণী কংগ্রেসকে কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে দেয় নি। মানজেরী অধিবেশন কৃষকদের কাছে আশার বাণী নিয়ে এসেছিল এবং কোজিকোডে একটি কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে জেলার অন্যান্য স্থানেও কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল কয়েকজন আইনজীবী, সাংবাদিক ও অন্যান্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ। কংগ্রেসে এঁরাই জমিদার শ্রেণীকে সরিয়ে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্দোলন হলো খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন। দুটি আন্দোলনই মোপলাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মোপলা কৃষকদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত মুসলমান। সুতরাং খিলাফৎ আন্দোলনে তাদের সমর্থন ছিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেস ও খিলাফতীদের মধ্যে ঐক্য মোপলা আন্দোলনে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। গান্ধী, সৌকত আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ প্রভৃতি জাতীয় স্তরের নেতা মালাবার পরিভ্রমণ করে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন। এর ফলে মালাবারের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেস খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়। মোপলা বিদ্রোহে কৃষকদের মৌলিক অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে ধর্মীয় প্রেরণা এইভাবে মিশ্রিত হ'য়ে যায়। মালাবারে এই সময় যে সব কৃষক সমাবেশ হ'য়েছিল, তাতে প্রধানতঃ মুসলমানরাই যোগদান করতো। হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। তবে কংগ্রেস খিলাফৎ নেতাদের জমিদার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী কিছু হিন্দু কৃষককেও এই সব সমাবেশে টেনে আনতো। কিন্তু ক্রমশঃ মোপলা বিদ্রোহে খিলাফৎই প্রধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও ডঃ ধানাগড়ে মনে করেন যে, মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া না থাকলে, তারা এইভাবে উৎসাহের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করতো কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।[২] আলি মুসালিয়ার নামে একজন স্থানীয় মোপলা নেতা দাবী করেন যে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় মোপলা সন্ত মামপ্রত্তি থাঙ্গল তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন যে, খিলাফৎ প্রতিষ্ঠার সময় সমাসন্ন এবং এর পর যে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপিত হবে, সেখানে ব্যক্তি সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না, পুলিশ বা আইন আদালত থাকবে না, এবং সবাই সুবিচার পাবে। তাছাড়া যার যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশি সে পাবে না। এই ধরনের আহ্বান মোপলা কৃষকদের প্রাণে আশার সঞ্চার করেছিল।

মোপলা বিদ্রোহের ব্যাপকতা সরকারকে উদ্বিগ্ন করেছিল। ১৯২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকার খিলাফৎ সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এরপর ইয়াকুব হাসান, গোপাল মেনন, মাধবন নায়ার, পি.মৌদিন কোয়া প্রভৃতি নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়। এর ফলে মোপলা বিদ্রোহের নেতৃত্ব চলে যায় স্থানীয় নেতাদের হাতে। সরকারী দমন নীতি সত্ত্বেও মোপলা বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে আলি মুসালিয়ারকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ একটি মসজিদের উপর আক্রমণ চালালে এক অত্যন্ত উত্তেজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশ এই শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র জনতার

Scanned with CamScanner

উপর গুলি বর্ষণ করলে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। জমিদারদের বাড়ী আক্রান্ত হয়। কাছারী, পুলিশ চৌকি, কোষাগার ও অন্যান্য সরকারী কার্যালয়েও হামলা চালানো হয়। প্রথম দিকে হিন্দু জমিদারদের আক্রমণ করা হলেও সাধারণতঃ দয়ালু জমিদার ও দরিদ্র হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হয় নি। কোন কোন নেতা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হিন্দুদের উপর যেন অযথা অত্যাচার করা না হয়। পরে কিন্তু মোপলা আন্দোলন সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। বহু হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। এই ভাবে মূলতঃ একটি জমিদার ও সরকার বিরোধী কৃষক আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে বিপথগামী হ'য়ে পড়ে। মোপলা বিদ্রোহ হিংসাশ্রয়ী হ'য়ে পড়ায় অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে এর যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়ে যায়। এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত সফল হয় নি। সরকার বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলন দমন করেন।

দক্ষিণ ভারতের রায়তওয়ারী এলাকায় রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সব সময়েই সোচ্চার ছিল। ১৯২৩ সালে তাঞ্জোরে এই ধরনের আন্দোলন আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিল। অন্ধ্র অঞ্চলের উপকূলবর্তী এলাকায় এন.জি.রঙ্গ ধনী কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২৩ সালে তিনি গুন্টুরে এক কৃষক সমিতি স্থাপন করেন। ১৯২৭ সালে সরকার গোদাবরী কৃষ্ণার বদ্বীপ অঞ্চলে রাজস্বের হার ১৮.৭৫ শতাংশ বাড়িয়ে দেন। এর ফলে ঐ অঞ্চলে এক জোরালো কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ভেন্নেতি সত্যনারায়ণ (পূর্ব গোদাবরী) ও দাস্তু নারায়ণরজু (পশ্চিম গোদাবরী)নামে দুই স্থানীয় কংগ্রেস নেতা। তাছাড়া টি প্রকাশন ও কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পাইয়া নামে জাতীয় স্তরের, দুই নেতাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ঠিক হ'য়েছিল যে স্বয়ং গান্ধী গুজরাটে সুরাট জেলায় বারদোলি তালুকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু চৌরিচোরার ঘটনার ফলে গান্ধী অসহযোগ প্রত্যাহার করায় সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তবে বারদোলি তালুকে গান্ধীর গ্রামীণ পুনর্গঠন ও উন্নয়নের কাজে হাত দেয়া হয় এবং স্থানীয় মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা হয়। কল্যাণজী মেহতা ও কুনরেরজী মেহতা নামে দুই ভাই ও দয়ালজী দেশাই নামে একজন স্থানীয় নেতা কৃষকদের মধ্যে অসহযোগের আদর্শ ছড়িয়ে দেন। এঁরা স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদের দেশপ্রেমের আদর্শে দীক্ষিত করেন; বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন গড়েন ও নানাবিধ সমাজ সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেন। এঁরা 'প্যাটেল বন্ধু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বারদোলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর উপজাতি কৃষক 'কালিপরাজ'দের অবস্থার উন্নতির জন্য ছটি আশ্রম খোলা হয়। অনুন্নত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার জন্য স্কুল স্থাপন করা হয়। গান্ধী স্বয়ং এই গঠনমূলক কাজে উৎসাহ দিতেন এবং তিনি কালিপরাজ (কালা মানুষ) নাম বদলে এদের নতুন নামকরণ করেন 'রাণীপরাজ' (অরণ্যের অধিবাসী)। নিম্নবর্গভুক্ত এই উপজাতিদের মধ্যে এই ধরনের গঠনমূলক কাজ সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ অবশ্যই পছন্দ করে নি।

আশ্রমের কার্যকলাপ কিন্তু কেবলমাত্র অনগ্রসর উপজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য শ্রেণীর কৃষকদের স্বার্থ নিয়েও আন্দোলন গড়ে তোলা হ'য়েছিল। ১৯২৬ সালে ভূমিকর ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করা হলে গান্ধী সম্পাদিত ইয়ং ইণ্ডিয়া ও নবজীবন পত্রিকায় তা নিয়ে অনেক লেখালেখি করা হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার শেষপর্যন্ত করের পরিমাণ বেশ কিছুটা কমাতে বাধ্য

হন (২১.৯৭ শতাংশ)। কিন্তু তাতেও বারদোলির কৃষকেরা সন্তুষ্ট হয় নি। আসলে এই সময়ে তুলোর দাম পড়ে যাওয়ায় কৃষকেরা খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। এই অবস্থায় মেহতা ভ্রাতৃদ্বয় বল্লভভাই প্যাটেলকে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। নেতা হিসাবে গুজরাটে প্যাটেলের স্থান ছিল গান্ধীর ঠিক পরেই। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সংগঠক হিসাবে, বক্তা হিসাবে এবং সবার উপরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকেরা কর বয়কট আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের জমি ও গবাদি পশু বাজেয়াপ্ত করেও সরকার তাদের নতি স্বীকার করাতে পারলেন না। অন্যদিকে 'কালিপরাজ' উপজাতিদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, তাদের হাত করে এই আন্দোলন ধ্বংস করার সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সরকার তাদের সহজ শর্তে জমি দিতে চাইলেও, তারা তাতে রাজী হয় নি। এদিকে প্যাটেল ও অন্যান্য স্থানীয় নেতা কখনও জাতিগত আবেদনের মাধ্যমে, কখনও আন্দোলন বিরোধীদের সামাজিক বয়কটের ভয় দেখিয়ে, আবার কখনওবা ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে, অর্থাৎ ভজন ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে এই আন্দোলনে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। উপজাতি কৃষকদের কাছে বলা হয় যে, তাদের দেবতা গান্ধীর উপর তাদের মঙ্গলের দায়িত্ব দিয়েছেন।

১৯২৮ সালের বারদোলি আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করেছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আবেদনের উপর নির্ভর করা হ'য়েছিল। হিন্দু কৃষকদের প্রভুর নামে এবং মুসলিম কৃষকদের খোদার নামে শপথ করে কর বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। এরপর গীতা ও কোরাণ পাঠ করা হতো। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক কবীরের ভজনও গাওয়া হোত। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বল্লভভাই প্যাটেল মহিলাদের এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর 'সদরি' উপাধি মহিলাদেরই দেওয়া। যে সব মহিলা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বোম্বাই-এর একজন পার্শী রমনী মিঠুবেন পেটিট, ভক্তিবা, প্যাটেলের বোন মনিবেন প্যাটেল, সারদাবেন শাহ ও সারদা মেহতার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় দেখা যেত কোন সমাবেশে মহিলাদের উপস্থিতি পুরুষদের ছাপিয়ে যেত। মহিলা ছাড়া ছাত্রদেরও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হ'য়েছিল।

বারদোলি কৃষক আন্দোলন সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য আমেদাবাদের শ্রমিকেরা ১৩০০ টাকা দান করেছিল। কমিউনিষ্টরাও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হ'য়েছিল। বোম্বাই কাউন্সিলের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন কে. এম. মুন্সী ও লালজী নারানজী। স্বয়ং বড়লাট আরউইন বোম্বাই সরকারের নীতির সমালোচনা করেন। এদিকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্যান্য কৃষকরাও বারদোলির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হওয়ায় সরকার চিন্তিত হ'য়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, কর বৃদ্ধি ছিল অযৌক্তিক। বর্ধিত কর ৬.০৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। বারদোলি কৃষক আন্দোলন সফল হয়। অধ্যাপক সুমিত সরকারের ভাষায়— "Gandhian nationalism certainly brought some concrete benefits for the peasart proprietors of Gujrat"[৩]

কংগ্রেস যে প্রধানতঃ শোষক শ্রেণীর স্বার্থই দেখতো, তার একটি প্রমাণ পাঞ্জাবের ঘটনা। এখানে ফজল-ই-হুসেন দরিদ্র কৃষকদের মহাজনী শোষণ থেকে রক্ষা করার

Scanned with CamScanner

জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরোধিতার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছিল। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জাব রিয়াসতী প্রজামণ্ডল পাতিয়ালা মহারাজের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। ১৯২৬ সালে পাতিয়ালা মহারাজ ভূমি রাজস্বের হার ১৯% বাড়িয়ে দেন। তাছাড়া মহারাজের শিকারের জন্য সংরক্ষিত বনভূমি থেকে বন্য পশু প্রায়ই নানা ভাবে কৃষকদের ক্ষতি করতো। এই সব কারণে কৃষকেরা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে ছিল। পাঞ্জাব রিয়াসতী মণ্ডলের সদস্যরা মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষিত হন। এই দলের কয়েকজন নেতা, যেমন জাগির সিং যোগ এবং মাষ্টার হরি সিং পরবর্তীকালে পাঞ্জাব কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক নেতা রূপে পরিচিত হন।

১৯২০এর দশকে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহে এক নতুন গতির সঞ্চার করেছিল গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২১ সালে বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠা কৃষক বিদ্রোহে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য এনেছিল। জমিদার-মহাজনী শোষণ ও অত্যাচার ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের তুলনায় পাটের মূল্যহ্রাস বাংলার কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৯১৯ সালে ত্রিপুরা কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে কৃষক বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক ১৯২০-২১ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে বাংলায় কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় ইউনিয়ান বোর্ড বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। নব প্রবর্তিত ইউনিয়ান বোর্ড খাজনার হার অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯২১-২২ সালে পাবনা, বগুড়া এবং বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমায় কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত হ'য়েছিল। অন্যদিকে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সাঁওতালরা কংগ্রেস নেতা শৈলজানন্দ সেনের নেতৃত্বে রাজস্ব দেয়া বন্ধ করে ও জঙ্গল কাটতে থাকে। তারা হাট ও পুকুরের মাছ লুঠতে থাকে। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় সাঁওতালরা গান্ধী টুপি পরে পুলিশের উপর আক্রমণ চালায়। তারা বিশ্বাস করেছিল গান্ধী টুপি পরলে বন্দুকের গুলি কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রংপুর জেলায় কর বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। নীলফামারি নামে একটি জায়গায় মুসলিম প্রজারা একজন 'গান্ধী দারোগা'র তত্ত্বাবধানে একটি 'স্বরাজ থানা' প্রতিষ্ঠা করে। ত্রিপুরাতেও কর বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। চট্টগ্রামে জঙ্গল লুঠপাট শুরু হয়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর বাংলার কৃষক আন্দোলন ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন বাংলার কৃষকদের অনুপ্রাণিত করলেও কংগ্রেস কিন্তু কৃষকদের হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ সমর্থন করে নি। তাছাড়া কংগ্রেস কর বয়কট আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিল। ১৯২২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বারদোলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে জমিদারদের আশ্বাস দেয়া হ'য়েছিল যে, কংগ্রেস তাঁদের আইনসঙ্গত অধিকারের উপর কোন হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের জানিয়ে দেয়া হ'য়েছিল যে, কর বয়কট নীতি কংগ্রেস সিদ্ধান্ত ও নীতি বিরোধী। কংগ্রেসের এই নীতি কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এর ফলে বাংলার কৃষক আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪] ১৯২৩ সালে সরকার যখন বর্গাদারদের জমিতে অধিকার দান করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তখন জমিদার, ধনী, কৃষক ও স্বরাজ দলের বিরোধিতায় তা কার্যকরী করা সম্ভবপর হয় নি।

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ১৯২০ সালের মধ্যে 'সংহতি', 'আত্মশক্তি', 'শঙ্খ', 'বিজলী', 'ধূমকেতু', 'দৈনিক বসুমতী' প্রভৃতি পত্র পত্রিকার মাধ্যমে মার্কসবাদী চিন্তাধারা বাংলার শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে বাংলার কৃষকরাও মার্কসবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়। তারা বুঝতে পারে যে জমিদাররাই তাদের দারিদ্র ও দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী। লেনিনের নেতৃত্ব তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে 'Workers and Peasants' Party'র আবির্ভাব (১৯২৬-২৮) বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই দল কংগ্রেস পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিল যে, কংগ্রেস হচ্ছে জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক। এই দল গণ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিল। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিই নয়, এই দল চেয়েছিল সমাজের গণতন্ত্রীকরণ, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ ও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারদের কাছ থেকে জমি দখল। 'লাঙল' ও 'গণবানী' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করে এই দল মার্কসবাদী চিন্তাধারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। তবে এই দলের প্রভাব ও চরিত্র কতটুকু কৃষক শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই দলের নেতারা ছিলেন মূলতঃ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের উৎসাহ, নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তবু এঁদের কথায় ও কাজে কিছু ফাঁক ছিল। সামগ্রিকভাবে কৃষকদের মধ্যে এঁদের প্রভাব খুব একটা ছিল না। এই দলের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে কোন কৃষক ছিলেন না। এঁদের মত ও পথের দিশারী ছিল রাশিয়া। স্বাভাবিক কারণেই তাই এই দল কৃষকদের মনের কোণে পুরোপুরি স্থান করে নিতে পারে নি। যাই হোক ১৯৩০-এর দশকে এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই দল কৃষক আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

* * * * *

১৯৩০ এর দশকের কৃষক আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেছিল দুটি ঘটনা। প্রথমটি হ'লো এই সময়ের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট বা মন্দা। ১৯২৯-৩০ সাল থেকে ভারতে এর ঢেউ স্পর্শ করে। এর ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম হু হু করে পড়ে যায়। সাধারণ পরিস্থিতিতেই কৃষকদের উপর কর ও রাজস্বের বোঝা ছিল দুর্বহ। এই অবস্থায় জমিদার বা সরকার কেউই মূল্যহ্রাসের সমানুপাতিক হারে কর বা খাজনার পরিমাণ হ্রাস না করায় কৃষকেরা খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ে। অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের তুলনায় কমে নি। ফলে কৃষকেরা সংসারের অন্যান্য দাবী দাওয়া মেটাতে অনেকাংশে অক্ষম হয়ে পড়ে, কারণ তাদের প্রকৃত আয় কমে গিয়েছিল। করের বোঝা ও মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পারায় অনেকেই জমি জমা হারাতে বাধ্য হয়। অপর ঘটনাটি হলো আইন অমান্য আন্দোলন। অবশ্য বিশ্বব্যাপী মন্দাই আইন অমান্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। আইন অমান্যের আগে ১৯২৮ সালের বারদোলি আন্দোলনের সাফল্যও কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আসলে গান্ধীর ভাবমূর্তি ও নেতৃত্ব ছিল কৃষকদের প্রেরণার উৎস। অর্থনৈতিক সংকট ও আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়া বিভিন্ন বামপন্থী দলের তৎপরতাও কৃষক আন্দোলনে এক নতুন ব্যাপ্তি দিয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেরণায় গুজরাটের সুরাট ও খেদা অঞ্চলের কৃষকেরা কর বয়কট আন্দোলন শুরু করে। সরকার এই আন্দোলন দমন

Scanned with CamScanner

করতে তৎপর হওয়ায় কৃষকেরা তাদের জমিজমা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী বরোদা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সরকার তাদের জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। কিন্তু যারা এই সব জমিজমা কিনে নিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে ও সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট আন্দোলন শুরু হয়। এই সব আন্দোলনের ফলে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ অনেক কমে যায়। এই অবস্থায় গান্ধী দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করার আগে এই দুই অঞ্চলে অনেকটা সময় কাটিয়ে যান। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সরকারকে জানিয়ে দেন যে, এখানকার কৃষকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার না করলে, তিনি তাঁর ইংল্যাণ্ড সফর বাতিল করে দেবেন। এর পর সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এখানে রাজস্ব বয়কট আন্দোলন কার্যতঃ কর বয়কট আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। গান্ধী এই বয়কট আন্দোলন পুরোপুরি সমর্থন করেন নি। তিনি একটি আপোষকামী নীতি অনুসরণ করে কৃষকদের কাছে আবেদন করেন যে, জমিতে অধিকার আছে, এমন কৃষকেরা যেন নির্ধারিত হারের প্রতি টাকায় ১২ আনা (বর্তমান ৭৫ পয়সা) ও অধিকারহীন কৃষকেরা প্রতি টাকায় ৮ আনা (বর্তমান ৫০ পয়সা) কর দেয়। তিনি তাদের সাবধান করে বলেন যে, যারা তাদের কর বয়কট করতে প্ররোচিত করেছিল, কৃষকেরা যেন তাদের কথায় কর্ণপাত না করে। কিন্তু গান্ধীর কথায় অনেক সময় কৃষকেরা কান দেয় নি। এই সময় রায়বেরিলিতে কালকা প্রসাদ ও অঞ্জনীকুমার নামে দুজন চরমপন্থী কংগ্রেস নেতার আবির্ভাব ঘটে। কর বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার শাস্তি স্বরূপ সেওগড়ের রাজা কয়েকজন কৃষকের জমি দখল করায়, এঁরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেস এই চরমপন্থী আন্দোলন সমর্থন করে নি। কালকা প্রসাদকে জেলা কংগ্রেস থেকে অপসৃত করা হয়। এর পর রায়বেরিলির পরিস্থিতি শান্ত হ'য়ে আসে। রায়বেরিলি ছাড়া বারাবাঁকি ও এলাহাবাদের মানঝানপুর তহশিলেও কৃষক বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। দুটি অঞ্চলেই কংগ্রেসের সংগঠন জোরদার ছিল না। যেখানে কংগ্রেস সংগঠন খুব শক্তিশালী ছিল (যেমন আগ্রা), সেখানে কৃষক বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে নি। বস্তুতঃ একদিকে কংগ্রেসের আপোষকামী নীতি এবং অন্যদিকে সরকারের কখনও দমন নীতি আবার কখনওবা কিছু সুযোগ সুবিধা দান করার নীতির ফলে যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনের ধার অনেক কমে আসে। যাই হোক যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় নি। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানকার কৃষকেরা কিছু বেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল, যদিও তা তাদের কাছে যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া তারা কংগ্রেস নেতৃত্বকে তাদের দাবী দাওয়ার গুরুত্ব কিছুটা বোঝাতে পেরেছিল।

যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন সকলের নজর কাড়লেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এই সময় কৃষক বিদ্রোহ হ'য়েছিল। কাশ্মীরের জম্মু অঞ্চলে মীরপুর, কোটলি, রাজৌরি প্রভৃতি তালুকে মহাজন বিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এর ফলে সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি বসাতে বাধ্য হয়। উড়িষ্যায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে কৃষক সভা স্থাপিত হয়। পুরী জেলায় জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। উপকূলবর্তী অন্ধ্র অঞ্চলে ভুগ্নিরালা বালরামকৃষ্ণইয়ার নেতৃত্বে একটি কর বয়কট আন্দোলন পরিকল্পনা করা হয়। ইনি তেলেগু ভাষায় "গান্ধী গীতা" নামে একটি গাথাকাব্য রচনা করেন, যা যথেষ্ট জনপ্রিয় হ'য়েছিল। নেলোর জেলায় বেঙ্কট গিরি নামে এক সুবিশাল জমিদারীর প্রজারা নিজেদের স্বার্থে

এক সংগঠন গড়ে তোলে। কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলায় মহাজন বিরোধী আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল। অন্ধ্রে অরণ্য সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেন এন.ভি.রামানাইডু ও এন.জি.রঙ্গ। মহারাষ্ট্র, বিহার ও মধ্যপ্রদেশেও (C.P.) এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে কিষাণ সভার নেতৃত্বে ভূমিরাজস্ব হ্রাস, জলকর হ্রাস, ঋণের পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি দাবী জানানো হয়। তাছাড়া এখানে রাজস্ব বয়কটের জন্যও আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

১৯৩০-এর দশকে বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলতঃ কিষাণ সভা, শ্রমিক কৃষক দল ও কৃষক প্রজা দল। মুসলিম লীগও সক্রিয় ছিল। কৃষক সভার ক্রমবর্ধমান প্রভাব লীগকে চিন্তিত করেছিল। পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকেরা যাতে ১৯৩৮ সালের মে মাসে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কিষাণ সভার অধিবেশনে যোগদান করতে না পারে লীগ সে চেষ্টা করেছিল। লীগের এই প্রচেষ্টা আংশিক সফল হ'য়েছিল। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলেও লীগ কিন্তু আলাদা কোন কৃষক সংগঠন গড়ে তোলে নি। অন্যদিকে কৃষক প্রজা দলের প্রভাব ছিল অনেক বেশি ব্যাপক, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত ধনী মুসলমান কৃষকদের মধ্যে। এই দলের কর্মসূচী ছিল যথেষ্ট বৈপ্লবিক। জমিদার সহ বিভিন্ন মধ্যসত্বভোগী শোষকের উচ্ছেদ সাধন ছিল এই দলের বিঘোষিত নীতি। এই দল কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যাকে সমধিক গুরুত্ব দিত। দেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মত রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে এই দল মাথা ঘামাতো না। তাছাড়া এই দল শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে আস্থাশীল ছিল না। কৃষকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা ছিল এই দলের লক্ষ্য।

বাংলাদেশে এই সময় যে সব কৃষক আন্দোলন হ'য়েছিল, তার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ আন্দোলন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে কৃষকদের সংগঠিত করেছিল শ্রমিক কৃষক দলের যুব সংগঠন ইয়ং কমরেড লীগ। এখানে জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামী মহাজনী কারবারও করতেন। কিশোরগঞ্জ আন্দোলন ছিল এই সব মহাজন জমিদারদের বিরুদ্ধে। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসের গোড়ায় চাষী খাতকগণ ঈশ্বরচন্দ্র শীল নামে একজন মহাজনের কাছে ঋণপত্র বা তনসুক প্রত্যর্পণ দাবী করেছিল। পাকুন্দিয়া, এগারসিন্ধু, জাঙ্গালিয়া, মির্জাপুর, জামালপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। জাঙ্গালিয়া গ্রামের জমিদার মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই আন্দোলন দমন করার জন্য গুলি চালান। এর ফলে আট ব্যক্তি নিহত হয়। ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত কৃষকেরা এই হত্যার বদলা নেয় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে হত্যা করে। ময়মনসিংহ ছাড়া ঢাকা, ত্রিপুরা, বগুড়া, নোয়াখালি ও রংপুর জেলাতেও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। কিষাণ সভার নেতৃত্বে বর্গাদাররাও সংগঠিত হয়। কৃষকেরা অনেকেই ঋণের দায়ে জমিজমা হারিয়ে তাদের মহাজনের অধীনে বর্গাদারে পরিণত হয় ও উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ পূর্বতন মহাজনকে দিতে বাধ্য হতো। মন্দার ফলে এদের অবস্থা আরও সঙ্গীন হ'য়ে পড়ে। উত্তর ও পূর্ব বাংলায় বর্গাদারদের মধ্যে কিষাণ সভার প্রভাব ছিল সমধিক। ১৯৩৯ সালে দিনাজপুরে বর্গাদারদের (আধিয়ারদের) আন্দোলন সফল হয় এবং জোতদাররা তাদের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য হয়। পূর্ব বাংলায় ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ পরগণায় এই আন্দোলন আংশিক সফল হ'য়েছিল।

১৯৩০ এর দশকে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে কিষাণ সভার ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। প্রথমে কিষাণ সভা আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল আঞ্চলিক ভিত্তিতে। এ

Scanned with CamScanner

বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল বিহার। ১৯২৮-২৯ সালে স্বামী সহজানন্দ এখানে একটি প্রাদেশিক কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের আপোষকামী নীতি ও জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিমুখ নীতির প্রতিবাদে তিনি ১৯৩২ সালে বিহার কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কিছু সদস্যও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। বিহারে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষতঃ আইনজীবীরা ছিলেন বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভার নেতা। এঁদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছু পরে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মীরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। বিহার ছাড়া অন্ধ্র ও বাংলাতেও কিষাণ সভা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ১৯২৮ সালে এন.জি.রঙ্গ ও এম.বি.নাইডু গুন্টুরে অন্ধ্র প্রাদেশিক রায়ত সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ১৯৩৪ সালের পর থেকে তা ক্রমশঃ প্রভাবশালী হ'য়ে ওঠে। কৃষকদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ১৯৩১ সালে নাইডু ও রঙ্গের নেতৃত্বে অরণ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। জঙ্গলে কৃষকদের গোচারণ ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের বংশানুক্রমিক অধিকার খর্ব করার জন্য জমিদারী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী দল ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে কৃষকদের সংগঠিত করেন। রঙ্গ ছিলেন মূলতঃ ধনী ও মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থের কথা তিনি কদাচিৎ চিন্তা করতেন। কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক এই সব কিষাণ সভাকে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার কথাও অনেকে চিন্তা করছিলেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে এগিয়ে এলেন এন.জি.রঙ্গ। ১৯৩৫ সাল থেকে তিনি অন্ধ্রের কিষাণ আন্দোলন দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে তৎপর হন। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ভারত কৃষক ও কৃষি শ্রমিক ফেডারেশন। রঙ্গ ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক ও ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ ছিলেন এর যুগ্ম সম্পাদক। অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের এক সভায় একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির মীরাট অধিবেশনে সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। রঙ্গ ছাড়া গুজরাটের ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এক সর্বভারতীয় কিষাণ সভা স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। যাই হোক ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে যখন লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, তখন নেহেরুর সমর্থনে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টরা মিলে নিখিল ভারত কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী সহজানন্দ। অন্যান্য যে সব নেতা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রঙ্গ, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, মোহনলাল গৌতম, সোহন সিং যোশ, কমল সরকার, সুধীন প্রামাণিক, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

কিষাণ সভা কৃষকদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে কিষাণ সভার এক ইস্তাহারে জমিদারী প্রথার বিলোপ, সর্বপ্রকার ঋণের বাতিল, বেগার প্রথার অবসান, ভূমি রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ ছাড়, অরণ্য সম্পদের অধিকার প্রভৃতি দাবী করা হয়। এই সব

দাবীর সমর্থনে মিছিল ও সভা সমিতিতে কৃষকেরা যোগ দেয়। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, কিষাণ দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হয়। বিহারের মুঙ্গের জেলার বারহাইয়া তালে জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন প্রদেশে নিখিল ভারত কিষাণ সভার প্রাদেশিক শাখা গঠন করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও কিষাণ আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয়। কিষাণ সভা এত জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে যে, এদের সদস্য সংখ্যা ১৯৩৮ সালের মধ্যে দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ লক্ষে।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল মহারাষ্ট্রের ফৈজপুরে। এর সভাপতিত্ব করেন এন.জি.রঙ্গ। এই অধিবেশন কৃষকদের এত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে প্রায় ২০০ মাইল দূরবর্তী মানমদ থেকে বহু কৃষক পায়ে হেঁটে এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। এই অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন জহরলাল নেহেরু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্র দেব, ডাঙ্গে, মাসানী, বঙ্কিম মুখার্জী প্রভৃতি নেতা।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্য ও অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন কৃষকদের কাছে এক আশার বাণী বয়ে নিয়ে এসেছিল। এর ফলে কৃষক আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার আসে। নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিভিন্ন মন্ত্রী এই সব প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য কৃষকদের সুবিধার্থে কয়েকটি সংস্কার কার্যকরী করেন। ফলে কৃষকদের আশা আরও বেড়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলন জোরদার হ'য়ে ওঠে। কেরলের মালাবার অঞ্চলে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উদ্যোগে কর ও ঋণের বোঝা লাঘব সহ বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৪০ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করায় কাজের কাজ কিছু হয় নি। তবে এর ফলে কৃষকেরা নিজেদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে ওঠে। উপকূলবর্তী অন্ধ্রে জমিদার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হ'য়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করায় কৃষকদের আন্দোলন পরিপূর্ণতা পায় নি। অন্ধ্রে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মকালীন স্কুল স্থাপিত হয়। এই সব স্কুলে অর্থনীতি ও রাজনীতির পাঠ দেয়া হতো। পি.সি.যোশী ও অজয় ঘোষের মত নেতা এই সব স্কুলে বক্তৃতা দিতেন। কৃষক আন্দোলনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল বিহার। এখানে স্বামী সহজানন্দ ছাড়াও কার্যানন্দ শর্মা, রাহুল সংকৃত্যায়ণ, পঞ্চানন শর্মা, যদুনন্দন শর্মা প্রভৃতি নেতা তৎপর ছিলেন। সভা সমিতি, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতির সাহায্যে এখানে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা হয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, বে-আইনী কর আদায়, জমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ও বেদখলী (বাকাস্ত) জমি প্রত্যর্পণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেসের পক্ষে এই ধরনের দাবী মেনে নেয়া কঠিন ছিল। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও কিষাণ সভার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মুঙ্গের, গয়া, দ্বারভাঙ্গা, শরণ প্রভৃতি জেলায় কৃষকেরা সত্যাগ্রহের পথে আন্দোলন চালিয়ে যায়। গয়াতে এই আন্দোলনের সাফল্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ রইলো না। জমিদারেরা লাঠিয়াল নিয়োগ করে এই আন্দোলন ধ্বংস করতে এগিয়ে আসেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ৬০০ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইনের সাহায্যে কিছু সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের খুশী করার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। কিন্তু তাতেও এই আন্দোলনের জের মেটেনি। ১৯৪৫ সালে আবার

Scanned with CamScanner

আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল। পাঞ্জাবে কৃষক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, জলন্ধর, লায়ালপুর, হোশিয়ারপুর প্রভৃতি অঞ্চল ছিল এই সব আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যের কৃষকরাও আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। বাংলায় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বর্ধমান জেলায় দামোদর খাল জলকর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের ফলে কৃষকেরা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হ'য়েছিল। এছাড়া উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ (C.P.) প্রভৃতি অঞ্চলেও কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

জমিদারী অত্যাচার ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন নতুন নয় এবং ১৯১৯ সালের আগে এ ধরনের বিদ্রোহ অনেকবার ঘটেছে। আগেকার আন্দোলনগুলি যেমন পুরোপুরি ব্যর্থ হয় নি, এ ক্ষেত্রেও হয় নি। ১৯১৯ সালের পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির মত এর পরবর্তী আন্দোলনগুলির পরে সরকার কৃষকদের স্বার্থে কিছু আইন প্রণয়ন করেছিল (যেমন ১৯২১ সালের অযোধ্যা কর আইন) অথবা রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল (যেমন ১৯২৮ সালের বারদোলি আন্দোলন)। কিন্তু ১৯১৯ সালের আগে যেমন ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় কোন মৌলিক বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটে নি। অর্থাৎ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বা মহাজনী ব্যবসার বিলোপ ঘটে নি। মহাজনী শোষণ সত্ত্বেও গ্রাম জীবনে ঋণের জন্য কৃষকদের মহাজনদের কাছে হাত পাতা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। ১৯১৯ সালের আগেকার কৃষক বিদ্রোহের মত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন কৃষক বিদ্রোহও কোন সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ করে নি। বিদ্রোহগুলি ছিল স্থানীয় অথবা আঞ্চলিক। তবে ১৯১৯ সালের পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহগুলি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে মিশে যাওয়ায় তার চরিত্রগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস শ্রেণী সংঘর্ষে বিশ্বাস করতো না এবং জমিদার ও মহাজন বিরোধী আন্দোলনে সব সময় কৃষকদের পাশে দাঁড়ায় নি; বরং অনেক ক্ষেত্রে জমিদার বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস সক্রিয় সহায়তা করে নি। বাংলা ও বিহারের কৃষক আন্দোলন বর্ণনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী মন্তব্য করেছেন — "The nationalist movement led by the Congress had in its early phase an elaborate agrarian programme, but could not provide an appropriate 'philosophy' for a broad-based peasant movement."[৫] তাছাড়া কৃষক আন্দোলনে সামান্যতম হিংসার প্রকাশ পেলে বা তা জঙ্গী আকার ধারণ করলে কংগ্রেস কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপনার রাশ টেনে ধরে তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে ভারতের কৃষক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস গণ আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল হ'লেও তা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করলে হঠাৎ সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিত। ভারতের কৃষক আন্দোলনে গান্ধী ও কংগ্রেসের ভূমিকা অবশ্য একটি বিতর্কিত বিষয়। অনেকে মনে করেন জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব নিয়ে মাথা না ঘামালেও গান্ধী কৃষকদের দরদী বন্ধু ছিলেন এবং তিনি শ্রেণী সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে গ্রাম পুনর্গঠন ও খাদি আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকদের স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর গ্রামোন্নয়ন ও হরিজন কল্যাণের আদর্শ কংগ্রেস কর্মী ও সদস্যরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, তাহ'লে কৃষকদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হতো। তাঁর নীতি ছিল আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করা এবং শোষক শ্রেণীর উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের সমস্যার সমাধান করা। এই ধরনের আদর্শ অবশ্য বাস্তবে কতটা কার্যকরী করা যেত তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ ছিল। যাই হোক গান্ধী ও কংগ্রেস পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা করলেও, এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, গান্ধীর প্রতি কৃষকদের ছিল অগাধ আস্থা। গান্ধীর সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য সাধারণ মানুষ তাঁকে আপনজন বলে মনে করতো। কৃষকেরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতো যে, ইংরেজ রাজের অবসানে ভারতে গান্ধীরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাদের দুঃখের দিন শেষ হবে। কৃষকেরা তাঁকে মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে বরণ করেছিল। তিনি ছিলেন তাদের পরিত্রাতা অবতার। আসলে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ পরিচালিত হয় ভাবাবেগের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা নয়। গুজব, জনশ্রুতি বা বিশ্বাস মানুষকে পেয়ে বসে। গান্ধীকে চোখে না দেখলেও তাঁর নামের যাদু কৃষকদের সম্মোহিত করেছিল। ১৯২১ সালে এক সরকারী প্রতিবেদনে বলা হ'য়েছিল— "The currency which Mr.Gandhi's name has acquired even in the remotest villages is astonishing. No one seems to know quite who or what he is, but it is an accepted fact that what he orders must be done..."[৬] তবু গান্ধীর নামে সব কিছু হয় নি বা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনের স্বরূপ অনেকের কাছে ধরা পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে কিষাণ সভার নেতাদের তীব্র মত বিরোধের কথা আমাদের মনে গান্ধীর আসে। গান্ধীবাদী বাবা রামচন্দ্র কংগ্রেসী নীতিতে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত লেনিন ও রাশিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।[৭]

কংগ্রেসী আন্দোলনে হতাশ হ'য়েই অনেক কৃষক নেতা বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কমিউনিষ্টদের পক্ষে কৃষকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন কাজ ছিল না। আদিবাসী কৃষক, বর্গাদার, দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ১৯৩০-এর দশকে ময়মনসিংহের হাজং উপজাতিদের মধ্যে মনি সিং এর আন্দোলন, ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনে রাজবংশী বর্গাদারদের লড়াই, থানায় গোদাবরী পারুলেকার প্রভৃতি আন্দোলনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্য, ধর্মীয় বিভেদ, জাতিভেদ প্রথা, জটিল কৃষি সম্পর্ক—এক কথায় ভারতের গ্রামীণ সমাজের কাঠামোগত জটিলতা শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে তোলার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভাবিত কমিনটার্নের নির্দেশে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের কর্মবিধি নিয়ন্ত্রিত হতো বলে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতো না। মনে রাখা দরকার যে কংগ্রেস নেতাদের মত কমিউনিষ্ট নেতারাও ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ এবং কৃষকদের মধ্যে সাম্যবাদী মতাদর্শ প্রচার করা হলেও তৃণমূল থেকে কোন উল্লেখযোগ্য কৃষক নেতার আবির্ভাব ঘটে নি। তবু ভারতের কৃষক আন্দোলনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে শ্রমিক কৃষক দল এবং বাংলা ও বিহারে কিষাণ সভার কার্যাবলী কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্ততঃ তারা কংগ্রেসের কিষাণ আন্দোলনের বিকল্প হিসাবে নিজেদের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছিল। বস্তুতঃ অনেক সময় কৃষকদের মধ্যে তাদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা কংগ্রেসের উদ্বেগের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেস তাদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তৎপর হ'য়েছিল। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস তাদের কর্মীদের কিষাণ সভার কার্যাবলী থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে বল্লভভাই প্যাটেল

Scanned with CamScanner

বলেন— "Comrade Lenin was not born in this country and we do not want a Lenin here. We want Gandhi and Ramchandra. Those who preach class hatred are enemies of the country."[৮]

দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের কৃষক আন্দোলন ভারতে কৃষি ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে নি। তাছাড়া এই আন্দোলন থেকে ধনী ও মাঝারি শ্রেণীর কৃষকেরা কিছুটা উপকৃত হ'লেও সাধারণভাবে বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটে নি। তবু এই সময়ের কৃষক আন্দোলন ভবিষ্যৎ সাফল্য ও সংস্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। স্বাধীনতার পরে জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটেছিল। অন্যদিকে কৃষক আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন গতির সঞ্চার করেছিল, যদিও অনেক সময় এর ফলে কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল। যাই হোক কৃষকদের অনেকেই যুগপৎ কিষাণ সভা ও কংগ্রেসের সদস্যপদ নিয়েছিল। মৃদুলা মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়—"The growth and development of the peasant movement was indissolubly linked with the national struggle for freedom."[৯] ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের রথের রশিতে শুধু শিক্ষিত উচ্চ বর্গের মানুষরাই টান দেয় নি।

শ্রমিক আন্দোলন

শ্রমিক বিদ্রোহ : *ভূমিকা—শ্রমিকদের অবস্থা—বেতন ও কাজের সময়—সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতি—প্রথম কারখানা আইন—শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত—প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিকা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ও আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি—১৯১৯-২০ সালে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও ইউনিয়ন গঠন—১৯২০ সালে A.I.T.U.C. র প্রতিষ্ঠা—জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান—১৯২২-২৭ সালের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের সাময়িক মন্দীভূত গতি—বোম্বাই-এর সূতীকল ধর্মঘট—১৯২৭ সালের রেল ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের আবির্ভাব—বোম্বাই সূতীকল ধর্মঘট ও গিরণি কামগড় ইউনিয়ন—বাংলায় চটকল শ্রমিক ও কলকাতায় ধাঙ্গড় ধর্মঘট—মাদ্রাজ ও জামসেদপুর ধর্মঘট—সরকারী দমননীতি ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা—১৯৩০ এর দশকের গোড়ায় শ্রমিক আন্দোলনের মন্দীভূত গতির কারণ—১৯৩৩-৩৪ সালে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি—কমিউনিষ্ট দলকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা—১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন ও শ্রমিক আন্দোলন—১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে শ্রমিক ধর্মঘট—ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য—ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও গান্ধী।*

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও আন্দোলন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি যতটা আকৃষ্ট করেছে শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাসে ঠিক ততটা করে নি। এর একটা বড় কারণ ভারতের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক এবং এখনকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারী ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন ছিল অনেক বেশি ব্যাপক এবং ইংরেজ শাসনের সূচনা পর্ব থেকেই অগণিত কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। ইংরেজ আমলের আগেও কৃষক বিদ্রোহ অজ্ঞাত ছিল না। আর একটি কারণ হলো যেহেতু ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এবং ঐ শতকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু-একটি শ্রমিক আন্দোলন ঘটলেও প্রকৃত অর্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ভারতে সংগঠিত

শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হ'য়েছিল, সেহেতু শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস অনেকটাই সাম্প্রতিক। তাছাড়া কৃষক বিদ্রোহ প্রায়শই শান্তিপূর্ণ থাকতো না। দাঙ্গা, হাঙ্গামা, হত্যা ও অন্যান্য হিংসাশ্রয়ী ঘটনা আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হতো। শ্রমিক আন্দোলন এই তুলনায় অনেক শান্তিপূর্ণ থাকতো। ফলে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ ছিল অনেক কম। তবু স্বাধীনতার আগেই প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রজনীপাম দত্ত শ্রমিক অসন্তোষ ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর India Today গ্রন্থে। সম্প্রতি শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাস চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং মরিস, ডি.মরিস, সুকোমল সেন, দীপেশ চক্রবর্তী, নির্বাণ বসু, রণজিৎ দাসগুপ্ত, সনৎ বসু, পঞ্চানন সাহা, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গবেষকের রচনা আমাদের ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধশালী করেছে।

যে কোন সামাজিক প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত তিনটি— (১) অমানবিক অত্যাচার ও শোষণের ফলে দুর্বিসহ জীবন এবং ক্ষোভের জন্ম; (২) সেই ক্ষোভের উৎস ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস এবং (৩) একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় নি। ভারতে যখন প্রথম আধুনিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন থেকেই শ্রমিকদের জীবনে যেন এক অভিশাপ নেমে আসে। চটকল ও সূতীকল শ্রমিকদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত এবং অবশ্যই তাদের মজুরি ছিল খুবই অল্প। ১৯০৮ সালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত Indian Factory Labour commission -এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, আমেদাবাদে একজন শ্রমিককে দিনে ১২ ঘন্টা, এবং যে কারখানায় বৈদ্যুতিক আলো ছিল সেখানে ১৪ ঘন্টারও বেশী কাজ করতে হতো। বোম্বাই-তে ৮৫টি সূতীকলের মধ্যে যে ৬০ টিতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল, সেখানে শ্রমিকদের ১৩ থেকে ১৫ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হতো। কলকাতার চটকলে শ্রমিকদের ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা খাটতে হতো। কোন কোন কারখানায় ১৭-১৮ ঘন্টা পর্যন্ত একটানা শ্রমিকরা কাজ করতো। ধন কল ও আটা কলে দিনে ২২ ঘন্টা পর্যন্ত শ্রমিকেরা পরিশ্রম করতো। এইভাবে পর পর সাত দিন কাজ করতে হতো। শিশু ও নারী শ্রমিকদেরও রেহাই ছিল না। ১৪ বছরের ছোট শিশু শ্রমিককে ১০ থেকে ১৪ ঘন্টা পর্যন্ত খাটানো হতো। কারখানার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ শ্রমিক ছিল শিশু শ্রমিক। ৭ বছরের ছোটরা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করতো। তুলো ধোনার কাজ প্রধানতঃ মেয়েরাই করতো। এ কাজ চলতো বছরে প্রায় ৮ মাস। এর মধ্যে পাঁচ মাস একটানা সকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ হতো। এই অমানুষিক পরিশ্রমে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তো। শ্রমিকদের বেতনও ছিল খুব কম। ১৮৯২ সালে সরকার যে অনুসন্ধান কমিটি বসান, তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে চটকলে একজন শিশু শ্রমিকের সাপ্তাহিক বেতন ছিল এক টাকা; দক্ষ মিস্ত্রীর সাপ্তাহিক বেতন ছিল ১০ থেকে ১২ টাকা; অদক্ষ শ্রমিকের সাপ্তাহিক বেতন ছিল খুব বেশি হ'লে ৩ টাকা; আর দক্ষ শ্রমিকের সাপ্তাহিক বেতন ছিল ৫ থেকে ৭ টাকা। ঐ সময়ে পশ্চিম ভারতে সূতীকলের পুরুষ শ্রমিক, নারী শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকের মাসিক বেতন হার ছিল যথাক্রমে ১২ টাকা, ৯ টাকা ও ৬ টাকা। ১৯৩৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে ভারতের প্রতিনিধি এস.ডি.পারুলেকার বলেছিলেন— "In India

Scanned with CamScanner

the vast majority of workers get a wage which is not enough to provide them with the meanest necessities of life."[১০] শ্রমিকেরা যে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বাস করতো, তার বিবরণ আমরা পাই ১৯২৮ সালের ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ান সদস্যদের বর্ণনায়। এই বিবরণে বলা হ'য়েছে— "We visited the worker's quarters wherever we stayed and had we not seen them we could not have believed that such evil places existed."[১১]

পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রমিকদের উন্নতিকল্পে সরকার আইন তৈরী করে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রে উল্টো ঘটেছিল। এখানে বিদেশী সরকার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকদের হাত শক্ত করে শ্রমিকদের এক প্রকার চিরদাসত্বে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই প্রণীত হ'য়েছিল The Assam Plantation Labour Immigration Act, The Madras Planter's Labour Act, The Master's and Servant's Act ইত্যাদি আইন। কোন শ্রমিক যাতে কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'য়েছিল। কিন্তু এক বিচিত্র কারণে সরকার প্রথম কারখানা আইন তৈরী করতে বাধ্য হয়। ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানা মালিকরা ভারতীয় মিল মালিকদের হিংসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, কারণ ভারতের শ্রমিকের মজুরি ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকের মজুরির তুলনায় অনেক কম ছিল। আসলে ইংল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের ফলে সেখানকার শ্রমিকেরা অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতো। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের মিল মালিকেরা দেখল যে, এর ফলে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং ভারতে শ্রমিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তারা সোরগোল তুলল। কিছু কিছু মানবদরদী বুদ্ধিজীবীও যে ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে ছিলেন, সে কথা স্বীকার্য। কিন্তু মূলতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের মালিক শ্রেণী তাদের ব্যবসার স্বার্থে ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষে ওকালতি করে। এদিকে ভারতে সোরাবজী সাপুরজী বেঙ্গলী নামে বোম্বাই-এর এক মানবদরদী ব্যক্তি সেখানকার শ্রমিকদের পক্ষে এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন, আর ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল মালিকেরা তাঁকে সমর্থন জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৮১ সালে ভারতে প্রথম কারখানা আইন তৈরী হয়। এই আইনে ৭ বছরের কমবয়সী শিশুদের কারখানায় নিয়োগ বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয় এবং ৭ থেকে ১২ বছরের শিশুদের কাজের সময় ৯ ঘন্টা ধার্য করা হয়। মজার কথা পশ্চিম ভারতের সূতীবস্ত্র শিল্পে, অর্থাৎ মূলতঃ ভারতীয় মালিকানাধীন শিল্পে, এই আইন বলবৎ হ'লেও কলকাতার চটকলে, যার মালিক ছিল ইউরোপীয়ানরা, এই আইন কার্যকরী করা হয় নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে মানবিক কারণে নয়, ঔপনিবেশিক স্বার্থেই এই আইন প্রণীত হ'য়েছিল।[১২] এর পর ১৮৯১ সালেও আর একটি আইন রচনা করা হয়। এই আইনে শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। শিশু শ্রমিকদের জন্য ৯ ঘন্টা ও নারী শ্রমিকদের জন্য ১১ ঘন্টা কাজের সময় বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু পুরুষ শ্রমিকদের কাজের সময় বেঁধে দেয়া হয় নি। তবে কারখানার মালিকেরা অনেক সময়ই এই সব আইন গ্রাহ্য করতো না। ১৯০৮ সালে Indian Labour Commission স্বীকার করেছিল যে, ৭ বছরের ছোট শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ অবাধে চলতো।

ভারতে প্রথম কবে ও কোথায় শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট হয়েছিল, তা বলা কঠিন। তবে ১৮৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে হাওড়া রেলস্টেশনে ১২০০ শ্রমিক

৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে যে ধর্মঘট করেছিল সম্ভবতঃ তা ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট।[১৩] সুকোমল সেনের মতে এই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ, কারণ এই ঘটনা ঘটেছিল চিকাগোর বিখ্যাত মে দিবস ঘটনার ২৪ বছর আগে।[১৩ক] এই ঘটনা নিয়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় লেখালেখি হ'য়েছিল। যাই হোক এই ঘটনার আগেও ১৮২৩ সালে কলকাতার পাল্কী বাহকেরা এবং ১৮৫৩ সালে নদী পরিবহনের কুলীরা কর্মবিরতি পালন করেছিল বলে জানা যায়। ১৮৭৭ সালে নাগপুরে এমপ্রেস মিলের শ্রমিকেরা মজুরীর দাবীতে ধর্মঘট করেছিল। ১৮৮০ সালের পর থেকে ঘন ঘন ধর্মঘট ঘটতে থাকে। ডঃ আর.কে. দাসের মতে ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ২৫ টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হ'য়েছিল।[১৪] ১৮৯৪ সালে বোম্বাইতে এবং ১৮৯৫ সালে আমেদাবাদে দুটি বড় ধর্মঘট হ'য়েছিল। ১৮৯৫ সালে বজবজে চটকলে যে ধর্মঘট হ'য়েছিল, তার ফলে কারখানাটি ৬ সপ্তাহ বন্ধ ছিল। ১৮৯৬ ও ১৯০০ সালে ঐ কারখানায় আবার ধর্মঘট হ'য়েছিল। ১৮৯৯ সালে Great Indian peninsular রেলপথে মজুরি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট হয়। তিলকের 'মারাঠী' ও 'কেশরী' পত্রিকায় এই ধর্মঘট সমর্থিত হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে শ্রমিক ধর্মঘটে জোয়ার আসে। এই সময়ে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট ঘটে। ১৯০৫ সালে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া প্রেসের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট প্রায় এক মাস ধরে চলেছিল। ১৯০৭ সালে বাংলার রেল শ্রমিকেরা ধর্মঘটের পথ নেয়। চটকলেও ধর্মঘট শুরু হয়। হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীতে ১২০০০ শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয়। মাদ্রাজের তুতিকোরিণ, পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি শহরেও ধর্মঘটের ঢেউ স্পর্শ করে। বোম্বাই-তে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। এখানে তিলককে কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা ধর্মঘট শুরু করে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে সব শ্রমিক আন্দোলন হ'য়েছিল, তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই প্রথম শ্রমিকেরা নিছক অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়েই ধর্মঘট করে নি; তারা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে। এতদিন তাদের আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অসংগঠিত। কিন্তু এই প্রথম বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, লিয়াকৎ হুসেন প্রভৃতি জাতীয় স্তরের নেতা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেন। অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বসু ও অপূর্ব কুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশী নেতা শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের সমর্থনে কলকাতার রাস্তাঘাটে মিছিল হয়। এই সময়েই প্রথম সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ান গড়ে তোলার চেষ্টা হ'য়েছিল। এই প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয় নি। আর এক দিক থেকেও এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়েই শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতন্ত্র মতাদর্শের অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যায়। রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী শ্রমিক নেতাদের অনুপ্রাণিত করে। যাই হোক স্বদেশী আন্দোলনের গতি মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে।

১৯১৯ সালের আগে সমস্ত শ্রমিক আন্দোলন ছিল অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সাধারণভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কংগ্রেস শ্রমিকদের স্বার্থ বা আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, সারা ভারতবাসীর স্বার্থ যেখানে জড়িত, কংগ্রেস একমাত্র সেই সবসমস্যা নিয়েই মাথা ঘামাবে এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা

Scanned with CamScanner

বা শ্রেণীগত সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস কোন ভাবনা চিন্তা করবে না। যাঁরা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, কংগ্রেস তাঁদের তা থেকে বিরত থাকতেই পরামর্শ দিত। তবু কিছু দরদী মানুষ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই রকম একজন মানুষ ছিলেন বরানগরের ব্রাহ্ম সমাজ সেবক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৭৪ সালে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রমিকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে সচেষ্ট হন। তিনি একটি নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্যণীয় বরানগর বোর্নিও জুট কোম্পানীর ম্যানেজার স্বয়ং মিঃ ডবলু. আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর একজন প্রধান পৃষ্টপোষক। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ডে গিয়েও ভারতীয় শ্রমিকদের করুণ অবস্থার কথা প্রচার করেন। পরিতাপের বিষয় ১৮৯০-এর দশকে চটকলে অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহ কমতে থাকে। অন্যদিকে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ব্যক্তি আসামের চা-কুলিদের উপর চা-কর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের কাহিনী তুলে ধরে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। কৃষ্ণ কুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় চা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা লেখা হয়। রামকুমার বিদ্যারত্ন লিখলেন 'কুলি কাহিনী' নামে একটি গ্রন্থ। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী চা বাগানের মালিকদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করলেন Justice Murdered in India গ্রন্থে। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত শ্রমিকদরদী এই সব বুদ্ধিজীবী অবশ্য এর কিছু বেশি কিছু করতে পারেন নি। তবু ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার বাহিরে যে সব বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের স্বার্থ তুলে ধরতে সচেষ্ট হন, তাঁদের মধ্যে সোরাবজী সাপুরজী বেঙ্গলী ও লোখাণ্ড-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোখাণ্ডে ১৮৮০ সালে 'দীনবন্ধু' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি Bombay Mill and Millhands' Association স্থাপন করেন। বোম্বাই-এর এই শ্রমিকবন্ধু শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং করতেন এবং তাদের ন্যুনতম বেতনের দাবীতে ৫,৫০০ জন শ্রমিকের স্বাক্ষর করা একটি স্মারক লিপি পাঠিয়েছিলেন Bombay Factory Commission এর কাছে।

শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ও আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের ঔদাসীন্যের একটা কারণ হ'লো কংগ্রেস চায় নি যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কোনভাবে দুর্বল হোক। কংগ্রেসী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হলে দেশীয় মিল মালিকদের সক্রিয় সমর্থন ও অর্থ সাহায্য কংগ্রেসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করে কংগ্রেস বৃহৎ শিল্পপতিদের সমর্থন হারাতে চায় নি। পরের দিকে অবশ্য এই নীতির কিছুটা পরিবর্তন হ'য়েছিল। যাই হোক প্রথম দিকে ভারতীয় সূতীকলে শ্রমিক ধর্মঘট কংগ্রেসের মনঃপুত ছিল না। এমন কি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ১৮৮১ ও ১৮৯০ সালের কারখানা আইনের বিরোধিতা করেছিল। তবে যে সব কারখানার মালিক ছিল ইউরোপীয়, সেখানে কংগ্রেস শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে আপত্তি করে নি। এই কারণেই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ১৮৯৯ সালের Great Indian peninsular Railway শ্রমিকদের ধর্মঘট সমর্থন করেছিল। ফিরোজশাহ মেহতা, দীনেশ ওয়াচা প্রভৃতি নেতা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলেছিলেন। গোড়ার দিকে শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের ঔদাসীন্যের আর একটি কারণ হলো যে, কংগ্রেস মনে করতো দ্রুত শিল্পায়ন হলো ভারতীয়দের দারিদ্র মোচনের একটি প্রধান উপায়। শ্রমিক অশান্তির দরুণ সেই

শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হোক, কংগ্রেস তা চায় নি। জি.এস্.আগারকার ছিলেন সেই সব বিরল ব্যক্তিত্বের মধ্যে একজন যাঁরা গোড়া থেকেই শ্রমিকদের স্বার্থ দেখতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ভারতে সংগঠিতভাবে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় এবং ক্রমশঃ তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে কল কারখানার মালিকরা এই সুযোগে প্রচুর মুনাফা অর্জন করলেও শ্রমিকদের বেতন বাড়লো না। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হয়। আবার ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্য শ্রম আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। হোমরুল লীগ আন্দোলন ও রাওলাট সত্যাগ্রহ শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করে। ১৯১৮ সালে মিসেস অ্যানি বেসান্তের সহকর্মী চেলভাপতি চেট্টি মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ান গঠন করেন। বি.পি.ওয়াদিয়া ছিলেন এর সভাপতি। ১৯১৯ সালের শেষ দিক থেকে ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে ভারতে ব্যাপক শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং অসংখ্য শ্রমিক আন্দোলন ঘটে। কানপুর, জামালপুর, কলকাতা, বোম্বাই, সোলাপুর, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, জামসেদপুর প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে একের পর এক ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুধু বাংলাতেই ১১০টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ১৯২১ সালেও শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার অব্যাহত রইলো। ঐ বছরের ২০শে মে আসামের চা বাগানের শ্রমিকেরা নির্মম অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে চা বাগান ছেড়ে নিজ নিজ মুলুকের পথে পা বাড়ালো। কিন্তু সরকার তাদের যাত্রাপথে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেন। চা বাগানের শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও চাঁদপুর গোয়ালন্দের জাহাজী শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করলো। ধর্মঘট ভাঙার জন্য সরকার অত্যাচার ও উৎপীড়নের পথ ধরলেও ধর্মঘটীদের মনোবল রইলো অটুট।

এই সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ানের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯২০ সালে বাংলায় শ্রমিক ইউনিয়ানের সংখ্যা ছিল ৪০টি, ১৯২১ ও ১৯২২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৫ এবং ৭৫। বোম্বাইতে ১৯২০ সালের আগে শ্রমিক ইউনিয়ান ছিল ৭টি। ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২৯টি ইউনিয়ান গঠিত হয়। এই সব ইউনিয়ানে নেতৃত্ব দিতেন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতারা। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন বোম্বাই-এর এন.এস যোশীর মত নরমপন্থী নেতা বা বোম্বাই-এর ব্যাপতিস্তা ও মাদ্রাজের ওয়াদিয়ার মত অ্যানী বেসান্তের অনুগামী নেতা, তেমনি ছিলেন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তিলকপন্থী কিছু যুব নেতা এবং বাংলার চরমপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এস.এন.হালদার, আই.টি.সেন, জীতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বসু বা হেমন্ত কুমার সরকারের মত তরুণ নেতা। এমন কি স্বামী দর্শনানন্দ (রাণীগঞ্জ) এবং স্বামী বিশ্বানন্দের (ঝরিয়া) মত রাজনৈতিক সন্ন্যাসীরাও শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ান। এদিকে এস.এ.ডাঙ্গে ও অন্যান্য কিছু তরুণ নেতা মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। মাদ্রাজে সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ারের মত প্রধান আইনজীবীও মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত এই সব নেতা কিন্তু সব সময় শ্রমিকদের স্বার্থ দেখতেন না এবং তাঁদের নেতৃত্বও সমালোচনার ঊর্ধে নয়। ট্রেড ইউনিয়ানগুলি ধর্মঘট ঘটার পর শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিত। অর্থাৎ ধর্মঘট হবার আগে তারা তৎপর হতো না। দেশীয় মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের

Scanned with CamScanner

বিরোধে নেতারা অনেক সময় মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে শ্রমিকদের আন্দোলন থামিয়ে দিতেন। ১৯২০ সালে এস. এন. হালদার ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রতিষ্ঠিত জামসেদপুর লেবার এ্যাসোসিয়েশন এই ভাবেই টাটার শ্রমিকদের হতাশ করেছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২০ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের (A.I.T.U.C.) প্রতিষ্ঠা। ঐ বছর ৩০শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই শহরে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে এর প্রথম অধিবেশন বসলো। দেওয়ান চমনলাল ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক। সারা দেশ থেকে ৮০৬ জন প্রতিনিধি এই সমাবেশে যোগ দেন। এই ধরনের একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন লোকমান্য তিলক, যাঁর সঙ্গে নাড়ির টান ছিল বোম্বাই এর শ্রমিকদের। লালা লাজপৎ ছাড়া অন্যান্য যে সব বিশিষ্ট জাতীয় স্তরের নেতা এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মতিলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, আনী বেসান্ত, জিন্না প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য অনুপস্থিতির তালিকায় ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই অধিবেশন চলেছিল ২রা নভেম্বর পর্যন্ত। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের জন্ম শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে এই প্রথম শ্রমিকেরা একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি শক্তিশালী সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার ফলে শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন ব্যাপ্তি আসে।

সভাপতির ভাষণে লালা লাজপৎ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত হবার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, যদিও নেতৃত্বের জন্য শ্রমিকেরা কিছুদিন বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ও নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল থাকবে, তথাপি শেষপর্যন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের নেতা খুঁজে বার করতে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রমিকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতেও অনুরোধ করেন- "Workers of India! .... your nation's leaders ask for Swaraj, you must not let them leave you out of the reckoning. Political freedom to you is of no worth without economic freedom. You cannot therefore afford to neglect the movement for national freedom. You are part and parcel of that movement." [১৫] পুঁজিবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদকে আক্রমণ করে তিনি বললেন— "Militarism and Imperialism are the twin children of Capitalism."[১৬] এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য তিনি শ্রমিক শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারতের পুঁজিপতি মালিকশ্রেণীকে সতর্ক করে দেন যে, তাঁরা যদি শ্রমিকদের স্বার্থ না দেখেন এবং কেবলমাত্র নিজেদের মুনাফার দিকেই নজর দেন, তাহলে শ্রমিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষও তাঁদের ক্ষমা করবে না। লালা লাজপৎ ছাড়া এই সময় কংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারাও শ্রমিক আন্দোলন ও A.I.T.U.C. র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ, সি.এফ. এণ্ড্রুজ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহেরু ও সত্যমূর্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। A.I.T.U.C.র তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২২ সালের বাৎসরিক অধিবেশনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস A.I.T.U.C.র গঠনকে স্বাগত জানায় এবং ট্রেড ইউনিয়ানের কাজে সাহায্য করার জন্য বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে একটি কমিটি

গঠন করা হয়। A.I.T.U.C. স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হ'য়ে ওঠে ও দিকে দিকে ইউনিয়ান গঠিত হয়। ১৯২০ সালে ১২৫টি ইউনিয়ান গড়ে ওঠে, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২,৫০,০০০।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শ্রমিক শ্রেণী ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে দমননীতি ও গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদস্বরূপ আমেদাবাদ ও গুজরাটের অন্যান্য শহরে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। আমেদাবাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রইলো না। পুলিশের গুলিতে ২৮ জন নিহত হন এবং ১২৩ জন আহত হন। বোম্বাই ও কলকাতাতেও এই আন্দোলনের ছোঁয়া লাগে। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে রেল শ্রমিকেরা রাওলাট সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন ও খিলাফতের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর-পশ্চিম রেলপথের শ্রমিকেরা একটি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই আন্দোলন উত্তর ভারতে অনেকাংশে সফল হয়। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ ভারত ভ্রমণ করেন। এই সুযোগে কংগ্রেস দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিলে শ্রমিকেরা তা সমর্থন করে। বোম্বাই শহরে ১,৪০,০০০ সূতীকল শ্রমিক ধর্মঘটে নামে। শ্রমিকেরা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এই আশায় যে, এই আন্দোলন সফল হ'লে তাদের মজুরি বাড়বে, মহাজনী শোষণ বন্ধ হবে এবং মালিক শ্রেণী তাদের উপর যে নির্মম আচরণ করে, তার অবসান হ'বে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর ১৯২২ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতা সাময়িকভাবে মন্দীভূত হ'য়ে পড়ে।

১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের আগে পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের গতি ছিল স্তিমিত। Royal Commission of Labour এর ভাষ্য অনুযায়ী ১৯২১ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ৩৭৬টি। কিন্তু ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে বাৎসরিক ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩০টির মত। শ্রমের ক্ষেত্রে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করলেও I.N.T.U.C.র সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে এর অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ানের সংখ্যা ছিল ১৮৩টি। ধর্মঘটের সংখ্যা কম হলেও কিন্তু এই সময়ের ধর্মঘটগুলি দীর্ঘস্থায়ী হ'য়েছিল। শ্রমিক-মালিক বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৯২১ সালে যেখানে ৭০ লক্ষ শ্রম দিবস নষ্ট হ'য়েছিল, ১৯২৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ২০২ লক্ষ। বস্তুতঃ ১৯২৪ সালের পর থেকেই নষ্ট শ্রম দিবসের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯২২ সালে দর্শনানন্দ ও বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে যে ধর্মঘট হ'য়েছিল, তা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্থায়ী হ'য়েছিল। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে আমেদাবাদে ৬৪টি সূতীবস্ত্র কারখানার মধ্যে ৫৬টি কারখানা শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বন্ধ হ'য়ে যায়। মালিক পক্ষ শতকরা ২০ ভাগ মজুরি কমিয়ে দেয় বলেই শ্রমিকেরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়। ১৯২২-২৩ সালে মাদ্রাজের বাকিংহাম কর্ণাটক মিলে ধর্মঘট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯২৩ সালে শ্রমিকনেতা সিঙ্গারভেলুর নেতৃত্বেই সর্ব প্রথম মাদ্রাজের সমুদ্রতটে মে দিবস পালিত হয়। ১৯২৫ সালে উত্তর-পশ্চিম রেলপথে একজন ইউনিয়ান নেতাকে বরখাস্ত করা হলে প্রায় ২২,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘট এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হ'য়েছিল। এই ধর্মঘটের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো লাহোরে শ্রমিকেরা যে মিছিল বার করেছিল, তার পতাকাগুলি শ্রমিকদের দেহের রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দেয়া হ'য়েছিল।

Scanned with CamScanner

এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হলো বোম্বাই-এর সূতাকল শ্রমিক ধর্মঘট। প্রথম দফায় এই আন্দোলন ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত চলেছিল। প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মঘটের কারণ ছিল মালিক শ্রেণীর বোনাস প্রদানে অসম্মতি। ধর্মঘট কিছু দিন চলার পর ব্যাপতিস্তা ও এন.এস. যোশী ধর্মঘটী শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রমিকেরা তাদের দাবীতে অটল থেকে আরও দু-মাস ধর্মঘট চালিয়ে যায়। পুলিশী অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ তাদের মনোবলে ফাটল ধরাতে পারে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনাহারের ভ্রুকুটি তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার ধর্মঘট শুরু হয়। দ্বিতীয় দফায় এই ধর্মঘটের কারণ ছিল শ্রমিকদের শতকরা ১১ $\frac{১}{২}$ ভাগ মজুরি হ্রাস। মালিক শ্রেণী শর্তসাপেক্ষে এই মজুরি প্রত্যাহার করতে রাজী হয়। মালিক শ্রেণীর বক্তব্য ছিল যে, সরকার যদি ৩ $\frac{১}{২}$% শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে তাঁরা শ্রমিকদের পুরো বেতন দেবেন। এই শুল্ক বসানো হ'য়েছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে এবং ১৮৯৪ সালে এই শুল্ক বসানোর পর থেকেই মিল মালিক ও জাতীয়তাবাদী নেতারা এই শুল্ক তুলে দেবার দাবী করছিলেন। তিন মাস পরেও যখন ধর্মঘটী শ্রমিকেরা তাদের দাবীতে অটল রইলো, তখন সরকার বাধ্য হ'য়ে এই শুল্ক প্রত্যাহার করে নেন এবং মালিক শ্রেণীও শ্রমিকদের দাবী মেনে নেয়। এই ভাবে শ্রমিকদের হাতিয়ার করে মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে।

১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের আগে পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন কিছুটা নিষ্প্রভ বলে মনে হ'লেও শ্রমিকদের চেতনা ও মনোবল যে এই সময় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। ভবিষ্যতের ঝোড়ো হাওয়ার ইঙ্গিত এই সময় থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। ১৯২৭ সাল থেকেই উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। ১৯২৭ সালের গোড়ায় কমিউনিষ্টদের বিভিন্ন গোষ্ঠী একত্র হ'য়ে শ্রমিক ও কৃষক দল গড়ে তোলে। নেতা হিসাবে এই সময় আত্মপ্রকাশ করেন ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আমেদ, পি.সি.যোশী এবং সোহন সিং যোশ। বামপন্থী গোষ্ঠী হিসাবে কংগ্রেসের মধ্য থেকেই প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তরে এই সব নেতা তাঁদের কাজ শুরু করেন। ১৯২৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী খড়গপুর রেল শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। এতে প্রায় ৫,০০০ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেন। মার্চ মাসে এই ধর্মঘটের অবসান হয়। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ ১৭০০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করতে উদ্যোগী হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধর্মঘট শুরু হয়। এরপর লিলুয়ার শ্রমিকরাও ধর্মঘটে সামিল হয়। এঁদের নেতৃত্ব দেন ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, কিরণ মিত্র ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মঘট চলাকালীন বামনগাছিতে পুলিশের গুলিতে ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দীর্ঘ ছ-মাস ধর্মঘটের পর ১৯২৮ সালের ১০ই জুলাই লিলুয়ার ধর্মঘটের অবসান হয়। খড়গপুরে ও লিলুয়ার রেল ধর্মঘট অবশ্য শেষপর্যন্ত সফল হয় নি। কিন্তু রেল শ্রমিকগণ যে অটুট মনোবল ও ঐক্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অবশ্যই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

১৯২৮ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। এর মধ্যে বোম্বাই-এর সূতীকল শ্রমিক ধর্মঘট সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক দীর্ঘ ছ-মাস ধরে এই আন্দোলন চালিয়ে যান। এই ধর্মঘটের কারণ ছিল মালিকদের শ্রমবিরোধী নীতি ও সিদ্ধান্ত। ১৯২০র দশকের শেষ দিক থেকে মিল

মালিকেরা ইংরেজ ও জাপানী প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য সরকারের কাছে শুল্ক সংরক্ষণ নীতির জন্য সুপারিশ করে আসছিলেন। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় তাঁরা এই ক্ষতির বোঝা শ্রমিকদের উপর চালান করতে চান। মালিকরা মজুরী হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যদিকে মালিকরা প্রত্যেক শ্রমিককে ছুটির বদলে তিনটি তাঁত চালাতে নির্দেশ দেন। মালিক শ্রেণীর এই নির্দেশের ফলে শ্রমিকদের কাজের চাপ বেড়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়। শ্রমিক ছাঁটাই হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন এ.এ.আলভে ও জি.আর.কাসলে পরিচালিত "গিরনি কামগড় মহামণ্ডল" এবং কমিউনিষ্ট প্রভাবিত "গিরনি কামগড় ইউনিয়ান"। এম.এন যোশীর নরমপন্থী সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়ানও এই আন্দোলনের সামিল হয়। বোম্বাই-এর ঐতিহাসিক সূতাকল ধর্মঘটে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের মধ্যে ডাঙ্গে, ঘাটে, মিরাজকর, নিম্বকর ও ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট নেতা বেঞ্জামিন ব্রাডলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের ফলে গিরনি কামগড় ইউনিয়ানের জনপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পায় যে, ১৯২৮ সালের শেষে এর সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩২৪ জন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪,০০০ জনে। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু ও বিঠলভাই প্যাটেল ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ান। এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য মালিক পক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করলেও শ্রমিকদের ঐক্যে কোন ফাটল ধরাতে পারেন নি। বোম্বাই-এর গভর্নর স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন ঃ "It is really amazing how the men are holding out... I have been considerably disturbed by the fact that the millowners opened a section of their mills on several occasions, and although adequate police protection was given, not a single man returned to work."[১৭] মালিকপক্ষ শেষপর্যন্ত শ্রমিকদের প্রধান দাবীগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়। স্থির হয় ১৯২৭ সালের মজুরীই বহাল থাকবে। এই ধর্মঘটের সাফল্যের ফলে বোম্বাই অঞ্চলে কমিউনিষ্টদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯২৮-২৯ সালে বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাউড়িয়া ও চেঙ্গাইলের চটকল শ্রমিকের ধর্মঘট ও কলকাতায় ধাঙ্গড় ধর্মঘট। ১৯২৮ সালে প্রথমে চেঙ্গাইলের লাডলো জুট মিলে ও পরে বাউড়িয়ার ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিলে ছ-মাস ধরে ধর্মঘট চলেছিল। এই ধর্মঘটে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, রাধারমন মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী প্রভৃতি নেতা নেতৃত্ব দেন। দীর্ঘ ছ-মাস ধরে অসাধারণ ধৈর্য্য ও মনোবলের পরিচয় দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকেরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। তবে মালিক পক্ষের এই জয় ছিল সাময়িক। ১৯২৯ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে বিভিন্ন দাবীতে ৬০,০০০ চটকল শ্রমিক প্রথম সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস ইউনিয়ানের সভাপতি ডঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মোমিন, কালী সেন, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবদুর রেজাক খাঁ, মনি সিং প্রভৃতি। এই ধর্মঘট প্রবল আকার ধারণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকেরা তাদের বেশ কিছু দাবী আদায় করতে সক্ষম হ'য়েছিল। মালিক পক্ষের কাজের ঘন্টা বাড়ানোর চেষ্টা ও শ্রমিক ছাঁটাই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শ্রমিকদের সমস্ত দাবী অবশ্য মালিক পক্ষ মেনে নেয় নি। তবু চটকল

Scanned with CamScanner

শ্রমিকদের সাফল্য অন্যান্য শ্রমিকদের যোগালো নতুন প্রেরণা ও উদ্যম। অন্যদিকে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে ৬ দিন ব্যাপী ধাঙড় ধর্মঘট কলকাতা মহানগরীর জীবন প্রায় অচল করে দিয়েছিল। এর আগে ১৯২০ সালেও একবার ধাঙড় ধর্মঘট হ'য়েছিল। এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন প্রভাবতী দাসগুপ্তা, ধরণী গোস্বামী, মুজফ্‌ফর আমেদ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, বেগম সাকিনা, ফারুক সুলতানা, আবদুল রেজ্জাক, মহম্মদ আলি প্রভৃতি নেতা। এই ধর্মঘটের ফলে জমাদারদের বেতন এক টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু পরে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় জুন মাসে আবার ধাঙড় ধর্মঘট হয়। ১৯৪০-এর দশকেও জমাদারেরা ধর্মঘট করেছিল।

বোম্বাই ও বাংলা ছাড়া মাদ্রাজেও ১৯২৮ সালে শ্রমিক আন্দোলন হ'য়েছিল। ঐ বছর জুলাই মাসে দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়েতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট ডাকে। এই ধর্মঘট অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। সরকার নির্মমভাবে এই ধর্মঘট দমন করেন। এই ধর্মঘটের দুই নেতা শিঙ্গারভেলু ও মুকুন্দলাল সরকারকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং পেরুমল নামে জনৈক জঙ্গী শ্রমিক নেতাকে আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২৮ সালে জামসেদপুরের ইস্পাত কারখানায় ধর্মঘট হ'য়েছিল। এই ধর্মঘট প্রায় পাঁচ মাস স্থায়ী হ'য়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু এই আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যস্থতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন সফল হয় নি। এই আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে ঘনশ্যামদাস বিড়লা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে ১৯২৯ সালের ১৬ই জুলাই এক চিঠিতে লিখেছিলেন— "I feel in a position to assure that Mr. Bose could be relied upon to help the Tata Iron and Steel works whenever necessary provided properly handled. When we deal with them we ought to study their psychology."[১৮]

শ্রমিক আন্দোলনের এই পর্বে শ্রমিকরা শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক দাবী বা অবস্থার উন্নতি কল্পেই আন্দোলন করে নি। জাতীয় আন্দোলন, এমন কি বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনে যে সব ঘটনা ঘটছিল, সে সম্পর্কেও যে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল, তা উল্লেখ করা দরকার। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে A.I.T.U.C. সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য আহ্বান জানায়। বহু শ্রমিক সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছিল। অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রমিক সমাবেশে মে দিবস, লেনিন দিবস, রুশ বিপ্লব দিবস প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়। বাংলার শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনার পরিচয় পাই ১৯২৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের সুবিশাল মিছিলের মধ্যে। ঐ দিন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস এসোসিয়েশন, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে মেনস্ ইউনিয়ান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ান, ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ইউনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন ইউনিয়ানের হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল করে কংগ্রেসের অধিবেশনে জোর করে হাজির হন। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মুজফ্‌ফর আমেদ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণী গোস্বামী, কিরণচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি নেতা। পরে একটি সভায় ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ও পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেস নেতারা শ্রমিকদের এই সব কার্যকলাপ সমর্থন করেন নি, বা সুনজরে দেখেন নি; এমন কি এর জন্য পুলিশ ডাকার কথা চিন্তা করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কোন বাধা দেন নি। তবে পূর্ণ স্বরাজের দাবীতে কংগ্রেস সায় দেয়নি।

১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণভাবে ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়া সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। বরং ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও মিল মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী সব সময়েই সক্রিয় ছিলেন। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার তৎপর ছিলেন। শ্রমিকদের ধর্মঘট ও হরতাল ভাঙ্গার জন্য ইংরেজ সরকার ঘৃণ্যতম পথ অনুসরণ করতেও ইতস্ততঃ করতেন না। ১৯২৯ সালের বোম্বাই সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য সরকার সুপরিকল্পিতভাবে পাঠানদের ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতেও অরাজী ছিলেন না। অব্রাহ্মণ মন্ত্রী ভাস্কররাও যাদব জাতপাতের জিগির তুলে নেতাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। বোম্বাই এর শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিলেন নীচু জাতির আর কমিউনিষ্ট নেতারা ছিলেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী এই সুযোগ নিয়েছিলেন এবং এইভাবেই কাসলেকে হাত করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে সরকার শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে তৎপর হন। ১৯২৯ সালে Public Safety Act ও Trade Disputes Acts এর মাধ্যমে সরকার কঠোর দমন নীতি গ্রহণ করেন। প্রথম আইনে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট নেতা ও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ফিলিপ স্প্র্যাট (Philip Spratt) ও বেন ব্রাডলেকে (Ben Bradley) বহিষ্কারের আদেশ দেয়া হয়। দ্বিতীয় আইন অনুসারে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের বিরোধ ট্রাইবুন্যাল দ্বারা নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক করা হয় ও ধর্মঘট বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস দুটি আইনেরই বিরোধিতা করে। তবে এই আইন সম্পর্কে বিতর্কের সময় অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্যই নাকি অনুপস্থিত ছিলেন। যাই হোক শ্রমিক আন্দোলনের বিষদাঁত ভাঙ্গার জন্য সরকার তিনজন ইংরেজ সহ (ব্রাডলে, স্প্র্যাট ও হাচিনসন) বোম্বাই থেকে ডাঙ্গে, মিরাজকর ঘাটে, জোগলেকার, অধিকারী, নিম্বকর, আলভে ও কাসলে, বাংলা থেকে মুজফ্‌ফর আমেদ, কিশোরীলাল ঘোষ, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, রাধারমন মিত্র, গোপাল বসাক, ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঞ্জাব থেকে সোহন সিং যোশ এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে পি.সি.যোশী ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেন। শুরু হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। দীর্ঘ চার বছর এই মামলা চলেছিল এবং অভিযুক্ত আসামীদের দীর্ঘ কারাবাস দেয়া হয়। কিন্তু কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ১৯২৯ সালের এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত দেশপাণ্ডে ও বি.টি.রণদিভের নেতৃত্বে গিরনি কামগড় ইউনিয়ান দ্বিতীয় বার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। তবে এই ধর্মঘট অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘদিন চালানো হ'য়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় ও এর ফলে গিরনি কামগড় ইউনিয়ান যথেষ্ট দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল।

অধিকাংশ কমিউনিষ্ট নেতা কারাবরণ করায় শ্রমিক আন্দোলনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা কিছুটা পূরণ করতে এগিয়ে আসেন কংগ্রেস নেতারা— কলকাতায় সুভাষচন্দ্র ও বোম্বাই-এ ভুলাভাই দেশাই। জামসেদপুরের কাছে বিদেশী মালিকানাধীন গোলমুড়ি টিন প্লেট কারখানায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করলে কংগ্রেস সেই ধর্মঘট সমর্থন করে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র বজবজে একটি ধর্মঘট ডাকেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ গোলমুড়িতে গিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ান।

১৯৩০ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনের গতি কিছুটা মন্দীভূত হ'য়ে আসে। এর একটা কারণ অবশ্যই একদিকে সরকারী দমন নীতি ও অন্যদিকে কমিশন গঠনের

Scanned with CamScanner

মাধ্যমে (যেমন ১৯২৯ সালে Royal Commission on Labour) শ্রমিকদের কিছুটা আশ্বস্ত করার প্রচেষ্টা। আর একটি কারণ হলো শীর্ষস্থানীয় শ্রমিক নেতাদের (প্রধানতঃ কমিউনিষ্ট) কারাগারে নিক্ষেপ। এছাড়া আরও একটি কারণ হলো ১৯২৯ সালে A.I.T.U.C.র ভাঙন। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, তখন এন. এম. যোশীর নেতৃত্বে উদারপন্থী গোষ্ঠী মূল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান ফেডারেশন নামে একটি পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলেন। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন কিছুটা দুর্বল হ'য়ে যায়। অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের বিভেদকামী নীতিও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। ১৯২৮ সাল থেকেই কমিউনিষ্টরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে ক্রমশঃ নিজেদের গুটিয়ে নিতে থাকে। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গিরণি কামগড় ইউনিয়ানের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৪,০০০ জন। ১৯২৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৮০০ জনে। A.I.T.U.C.র মধ্যে কমিউনিষ্টদের প্রভাব কমতে থাকে। নেহেরুর মত বাম ঘেঁষা কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আগাগোড়াই নিরুৎসুক ছিল। আবার ১৯৩০ এর দশকের গোড়ায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং জিনিসপত্রের দামও কমতে থাকে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের পক্ষে কোন আন্দোলন গড়ে তোলা দুরূহ হ'য়ে পড়ে। ১৯৩১ সালে জাতীয় নেতাদের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে কমিউনিষ্টরা রেড ট্রেড ইউনিয়ান-কংগ্রেস নামে আর একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ আরও তীব্র হয় এবং শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরে।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও এবং আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রমিকেরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও শ্রমিক আন্দোলন অব্যাহত ছিল। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন সোলাপুরের সুতাকল শ্রমিকরা, করাচীর বন্দর শ্রমিকরা, কলকাতার পরিবহন ও মিল শ্রমিকরা ও মাদ্রাজের মিল শ্রমিকরা সরকারী বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। সোলাপুর রেল স্টেশন, পুলিশ চৌকি, আদালত প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয় এবং শহরে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। সরকার সামরিক আইন জারী করে এবং কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই আন্দোলন ভেঙ্গে দেন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়েতে একটি ব্যর্থ শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ঐ বছর এপ্রিল মাসে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আবদুল মোমিন প্রভৃতির নেতৃত্বে কলকাতায় মোষের গাড়ীর গাড়োয়ানরা পথ অবরোধ করে যে আন্দোলন শুরু করে, তা দমন করতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। কলকাতা পুলিশ দুপুর বেলা মোষের গাড়ী চালানো বন্ধ করে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, এই আন্দোলন ছিল তারই বিরুদ্ধে। আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার শেষ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৩৩-৩৪ সালে জোরদার শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩২ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১১৮টি এবং এতে মোট ১,২৮,০৯৯ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ও ধর্মঘটীদের সংখ্যা

ছিল যথাক্রমে ১৪৬টি ও ১৫৯টি এবং ১,৬৪,৯৩৮ ও ২,২০,৮০৮। বিদেশী মালিকানাধীন চটকল ও ভারতীয় মালিকানাধীন কাপড়ের কলে শ্রমিক ছাঁটাই ও বেতন হ্রাস চতুর্দিকে গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। এদিকে ট্রেড ইউনিয়ানগুলির অনৈক্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অন্তরায় ছিল। তবু এই সময় বোম্বাইতে বি.টি.রণদিভে ও এস.ভি.দেশপাণ্ডে এবং কলকাতায় আবদুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ভি.বি.কার্ণিক, মনিবেন কারা, রজনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার নামে একজন ব্যারিষ্টার Labour Partyর সূত্রপাত করেন। ১৯৩৪ সালে যে সব ধর্মঘট সংগঠিত হ'য়েছিল, তাদের মধ্যে সোলাপুর, নাগপুর ও বোম্বাই এর হরতাল ও ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট উল্লেখের দাবী রাখে। এই সব ধর্মঘটের ফলে কমিউনিষ্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন ও ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট দল সরকারীভাবে বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়।

১৯৩৭ সালে আবার শ্রমিক আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। ১৯৩৭ সালে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন ভারতের অন্যান্য মানুষের মত শ্রমিক শ্রেণীর মনেও আশার সঞ্চার করেছিল। নির্বাচনে A.I.T.U.C. সাধারণভাবে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেছিল। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিকদের ইউনিয়ান গঠনের ও ধর্মঘটের অধিকারের কথা বলা হ'য়েছিল। মালিক শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেস আন্তরিক প্রয়াসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বস্তুতঃ ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ানের সংখ্যা ২৭১ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৬২তে এবং এই সব ইউনিয়ানের মোট সদস্য সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২,৬১,০৪৭ থেকে ৩,৯৯,১৫৯তে। অন্যদিকে কমিউনিষ্টরাও তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি বদল করে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে আবার যোগ দেয়। ১৯৩৫ সালে তারা আবার I.N.T.U.C. তে যোগ দেয়। নেহেরু ও সুভাষের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যে বাম প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, কমিউনিষ্টরা তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে ভারতের বামপন্থী শক্তিগুলিকে আরও সক্রিয় করে তোলে। ১৯৩৭ সালের গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক ধর্মঘটগুলির মধ্যে বাংলার চটকলগুলিতে সাধারণ ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধর্মঘটে প্রায় ২৫,০০০ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেছিল। ফজলুল হক মন্ত্রীসভা এই ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য কঠোর দমনমূলক নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ বাংলার ছাত্রসমাজ ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থন করে। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর দাবী দাওয়া সম্পর্কে কিছু প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। এই সময়ের অন্যান্য ধর্মঘটগুলির মধ্যে কানপুর, অমৃতসর, আমেদাবাদ ও মাদ্রাজের কাপড়ের কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট, ১৯৩৮ সালে কুলটি ও হীরাপুরে মার্টিন বার্ণ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ধর্মঘট ও ১৯৩৯ সালে ডিগবয়ে খনিজ তৈল শ্রমিক ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক আন্দোলনের এই ব্যাপ্তি ও কংগ্রেসের শ্রমিকদরদী মনোভাব অবশ্য বিড়লা ও অন্যান্য শিল্পপতির মনঃপুত ছিল না। সুতরাং কংগ্রেসকে কিছুটা সংযত হতে হয়। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রণীত Bombay Trades Dispute Act-এর মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন খর্ব করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই আইনে মালিক শ্রমিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য

Scanned with CamScanner

বাধ্যতামূলক সালিশী ও বে-আইনী ধর্মঘটের জন্য ছ-মাস কারাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলিম লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই আইনের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। এর বিরুদ্ধে বোম্বাইতে যে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হ'য়েছিল, তাতে ৮০,০০০ শ্রমিক অংশ নেন। ডাঙ্গে, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও আম্বেদকার এই সমাবেশে ভাষণ দেন। সারা প্রদেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধে যে হরতাল ও ধর্মঘটের ডাক দেয়া হ'য়েছিল, তাও আংশিক সফল হ'য়েছিল।

শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ সুকোমল সেন ১৯৩৭-৩৮ সালের শ্রমিক ধর্মঘটগুলির পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৯] প্রথমতঃ এই সময়ের শ্রমিক ধর্মঘটগুলি কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, কানপুর বা সোলাপুরের মত কেবলমাত্র বড় বড় শিল্প শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর প্রভাব সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ পাটশিল্প বা বস্ত্রবয়ন শিল্প ছাড়াও অন্যান্য অপ্রধান শিল্প শ্রমিকরাও এই সময় ধর্মঘটে সামিল হ'য়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নারকেল ছোবড়া শিল্প, জব্বলপুরের মৃৎশিল্প, বেরিলির কাঠ-চেরাই কারখানা প্রভৃতির কথা বলা যায়। তাছাড়া বিড়ি শ্রমিক, কলকাতার গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রমিকরাও এই সময় ধর্মঘট করেছিল। তৃতীয়তঃ এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের সুর ছিল আরও চড়া তারে বাঁধা। শ্রমিকদের দাবী দাওয়া ছিল আরও বেশি। অর্থাৎ এই সময় তারা শুধু মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করে নি, তারা মজুরি বৃদ্ধির দাবীও জানিয়েছিল। চতুর্থতঃ এই পর্যায়ের অধিকাংশ ধর্মঘটই সফল হ'য়েছিল। পঞ্চমতঃ ১৯৩৭-৩৮ সালে শ্রমিকেরা শুধু তাদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়েই আন্দোলন করে নি; তারা তাদের ট্রেড ইউনিয়ানগুলির স্বীকৃতির জন্যও লড়াই করেছিল।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি হেতু শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং তাদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৩৯ সালের ২রা অক্টোবর বোম্বাই-এর ৯০,০০০ শ্রমিক যুদ্ধ বিরোধী ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধর্মঘট তাদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দেয়। ১৯৩৯ সালে কলকাতা, জামসেদপুর, ঝরিয়া, ধানবাদ, ডিগবয়, বোম্বাই, কানপুর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি শহরে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। তবে ১৯৪০-৪১ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা কমতে থাকে। এই সময় কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে শ্রমিক কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতার বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করে। এ ছাড়া বেতন বৃদ্ধি ও বোনাসের দাবীতেও ধর্মঘট হয়। ১৯৪১-৪৩ সালে ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরেও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, বোনাস প্রভৃতির দাবীতে আন্দোলন হয়। ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করায় কমিউনিষ্ট নেতারা তাঁদের নীতি পরিবর্তন করেন। তাঁরা নাৎসি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেন। তাঁরা গান্ধীর ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন এবং শিল্পক্ষেত্রে শান্তির নীতি অনুসরণ করেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা কল কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখার কথা বলেন। শ্রমিক আন্দোলন থেকে কমিউনিষ্টরা এইভাবে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন যথেষ্ট দুর্বল হ'য়ে যায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ হয় নি। গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বোম্বাই, নাগপুর, আমেদাবাদ, জামসেদপুর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি শহরে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। যুদ্ধের পর ১৯৪৫ ও ১৯৪৭

সালের মধ্যেও শ্রমিকেরা তাদের সংগ্রামী মনের পরিচয় দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির সমর্থনে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল। তাছাড়া বোম্বাই-এর নাবিক বিদ্রোহের সমর্থনেও সেখানকার কলকারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অন্যান্য যে সব ধর্মঘট হ'য়েছিল, তার মধ্যে সারা ভারত ডাক ও তার শ্রমিক ধর্মঘট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমতঃ ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, এমন কি নিরক্ষর হলেও, তাঁদের মধ্যে এক ধরনের স্বাভাবিক চেতনা ছিল, যা থেকে তাঁরা তাঁদের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারতেন ও তাঁর প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করতেন। তাঁদের আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁদের দৃঢ়তা ও ঐক্যবোধ ছিল প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব কোন নেতা ছিল না। অর্থাৎ অধিকাংশ কৃষক বিদ্রোহে কৃষক নেতারাই নেতৃত্ব দিলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা হয় নি। নেতৃত্বের জন্য তাঁরা কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট নেতাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন শ্রমিক বিদ্রোহের নেতা। এঁদের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠার অভাব হয়ত ছিল না। ভারতের শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা ও অবদান অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তবু শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি এঁদের উপর নির্ভরশীল ছিল বলে এবং অনেক সময়ই এঁদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল বলে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। আমরা দেখেছি কি ভাবে কংগ্রেসের মধ্যে নানা মতভেদ এবং কমিউনিষ্টদের পরিবর্তনশীল নীতি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের রাশিয়া অভিযান শ্রমিক আন্দোলনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করেছিল। আমরা এও দেখেছি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় নেতাদের মনোভাব সব সময় শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। বিশেষতঃ দেশীয় মালিকদের সঙ্গে সংগ্রামের সময় নেতারা হয়ত কিছুটা নিরুপায় হ'য়েই শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে মালিকদের স্বার্থ দেখতেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পপতি বিড়লার কথা মনে পড়ে। শ্রমিকদের খুশী করতে গিয়ে কংগ্রেস বিড়লার অপ্রীতিভাজন হতে চায় নি। কমিউনিষ্ট নেতাদের এই ধরনের সমস্যা ছিল না। তবুও তাঁদের সংকীর্ণ নীতি অনেক সময় শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে শ্রমিক আন্দোলন অনেক সময় বিপথগামী হতো। শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ভারতের শ্রমিকরা তাঁদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন করতেন। শ্রমিক আন্দোলনে কদাচিৎ হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটতো। এমন কি কমিউনিষ্ট নেতারাও শ্রমিকদের নিয়ে কোন জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। লুডাইট আন্দোলনের মত কোন আন্দোলন ভারতে সংগঠিত হয় নি। তৃতীয়তঃ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে কোন আন্দোলন এখানে গড়ে ওঠে নি। কংগ্রেস নেতারা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁদের দায়িত্বের কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কমিউনিষ্টদের বিঘোষিত নীতি ছিল শ্রেণী সংগ্রাম। এই বিষয়ে তাঁরা শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তুলতে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস পান নি। অশিক্ষিত এবং বহু বর্ণ ও ধর্মে বিভক্ত শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের চেতনা গড়ে তোলার কাজ অবশ্যই সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং এই সীমাবদ্ধতা হয়ত অস্বাভাবিক ছিল না। তবু ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য ভারতের

Scanned with CamScanner

শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। শ্রমিকেরা শ্রেণীগত দাবী ও সমস্যা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অনেক সময় নিজেদের ধর্মীয় ও গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন। মুসলিম শ্রমিকেরা ঈদ্ বা মহরমের ছুটি দাবী করতেন। অন্যদিকে হিন্দুরা দাবী করতেন রথযাত্রা বা অন্যান্য হিন্দুধর্মের উৎসবে ছুটি। তার চেয়েও আক্ষেপের কথা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা অনেক সময় সামগ্রিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে এইভাবে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'য়েছিল। প্রসঙ্গতঃ এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিক ও কৃষকের মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কোন প্রচেষ্টাও জাতীয় স্তরের নেতারা করেন নি। অন্যদিকে শ্রমিকরা যে কেবল নিজেদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়েই সংগ্রাম করেন নি, তাঁরা যে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে ও অবগাহন করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। ইংরেজ সরকারও শ্রমিকদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল। এর প্রমাণ বোম্বাই-এর গভর্ণর সাইকস ও বাংলার গভর্ণর স্ট্যানলী জ্যাকসনের সঙ্গে পত্র বিনিময়।[২০] জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক মতাদর্শের সমন্বয় এই দুই গভর্ণরের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল, কিন্তু জাতীয় নেতারাই অনেক সময় শ্রমিকদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অধ্যাপক সুমিত সরকার এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন— "It was probably not a coincidence that both Non Co-operation and civil Disobedience were launched after, and not during, peak points of labour unrest." [২১] জাতীয় নেতাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপেই অনেক সময় শ্রমিক আন্দোলন মাঝপথে থেমে যেত। দরিদ্র মজুর শ্রেণী যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে অসম সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তা যদি সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সমাজের উচ্চ শ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতা পেত, তাহ'লে হয়ত তাঁদের আন্দোলন সফল হতো।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয় নি। অধ্যাপক সুমিত সরকারের ভাষায়— "As for Labour, its concrete achievements in the building up to a fairly strong countrywide trade union movement should not be underestimated."[২২] অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা তাদের দাবী দাওয়া আদায় করতে সক্ষম হ'য়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামেও তাদের ভূমিকা ও অবদান প্রশংসনীয়। ১৯০৮ সালে তিলককে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে শ্রমিক ধর্মঘট থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজ সেনানীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন ও বোম্বাই-এর নাবিক ধর্মঘটে শ্রমিকদের সমর্থন পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রেই আমরা শ্রমিকদের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসু 'আত্মশক্তি'তে লিখেছিলেন— "শ্রমিক আন্দোলন মানবের স্বাধীনতার নতুন বার্তা লইয়া আসিতেছে। এতদিন পরে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিলে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসিবেই, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।" [২৩] শ্রমিকদের মধ্যে এই চেতনা অবশ্যই ভবিষ্যৎ সাফল্যের পাথেয় ছিল।

শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনায় ইতি টানার আগে ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলে নি। শ্রমিক আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা অনেকেরই মনঃপুত হয় নি এবং অনেকেই তাঁর কঠোর

সমালোচনা করেছেন। গান্ধী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে প্রথম সক্রিয়ভাবে মাথা ঘামান ১৯১৮ সালে আমেদাবাদ সূতাকল শ্রমিক ধর্মঘটের সময়। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করেন তাঁর সত্যাগ্রহের অস্ত্র। মিল মালিকরা শেষ পর্যন্ত ৩৫% মজুরি বৃদ্ধি করতে রাজী হন। এর পর তিনি সাধারণভাবে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ দেখান নি। এমন কি ১৯২০ সালে যখন A.I.T.U.C. প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি কোন সহযোগিতা করেন নি বা সেই অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত Ahmedabad Textile Labour Association (1918), যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪,০০০ শ্রমিক, A.I.T.U.C. এর সঙ্গে যুক্ত হয় নি। অনেকেই মনে করেন গান্ধীর নীতি ছিল শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে পুঁজিপতি শিল্পপতিদের সঙ্গে আপোষ করা। শিল্পপতি ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গান্ধী নাকি মনে করতেন যে, "অনুগত ভৃত্যরা বিনা পারিশ্রমিকেও তাদের প্রভুকে সেবা করে।"

আসলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে গান্ধীর নিজস্ব ধারণা ছিল অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গান্ধী শ্রেণী সংঘর্ষে কোন দিনই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চাইতেন বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতা। অন্যদিকে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা এবং তিনি চাইতেন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই একসাথে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করুক। আমেদাবাদ শ্রমিক ধর্মঘটের সময়ই গান্ধী মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও এ বিষয়ে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করতেন উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো দুই অংশীদারের সম্পর্কের মত। মালিকরা হচ্ছে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার অছি। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বাঁধলে তা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও সালিশীর মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা উচিত। কেবলমাত্র ধর্মঘট করা বা নিজেদের অধিকার সরবে ঘোষণা করাই ট্রেড ইউনিয়ানের প্রধান কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন না। শ্রমিক ও তাঁর পরিবার পরিজনের অবস্থার উন্নতির জন্য ট্রেড ইউনিয়ানের তৎপর হওয়া উচিত। এর জন্য বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী, যেমন শিশু বিদ্যালয় স্থাপন, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, মদ্যপান নিরোধ প্রভৃতি গ্রহণ করা কর্তব্য। গান্ধী স্বয়ং এই সব পরিকল্পনা কার্যকরী করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন শংকরলাল ব্যাঙ্কার ও প্রখ্যাত মিলমালিক অম্বালাল সরাভাই-এর ভগিনী অনুসূয়া বেন। যাই হোক মালিক শ্রেণীর মত সরকারকেও তিনি শ্রমিকদের অছি বলে মনে করতেন। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আইন সভার সদস্যদের দায়িত্ব হলো শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা। গান্ধী মনে করতেন শ্রমিকরাই কারখানার আসল মালিক, কারণ তাদের শ্রম পুঁজিপতিদের সম্পদের চেয়েও অনেক দামী। কিন্তু কোন কারণে যদি মালিক পক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন না করে সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের কি করণীয়, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী তাদের সত্যাগ্রহের পথ অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি কখনই শ্রমিকদের-মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চান নি। ঠিক্ তেমনি শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করা হোক, তাও তিনি চান নি। তিনি বলতেন— "Labour should not be allowed to be a pawn in the political chess board."

গান্ধীর এই মতাদর্শ ও চিন্তাধারা অনেকেই সমর্থন করেন নি। কমিউনিষ্ঠরা তো তাঁর সঙ্গে কোন ক্রমেই একমত হতে পারেন না। ডাঙ্গে বলেছিলেন— "In such a conception, the working class was not a class, but something akin

Scanned with CamScanner

to the Sudra Varna. It was his duty to labour and it was the duty of the owning rich to feel him and treat him well."[২৪] কিন্তু গান্ধীর মত বা পথ যাই হোক, তিনি নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। তিনি শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়ে অন্য কোন ভাবে মাথা ঘামান নি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এমন একদিন আসবে, যেদিন তাঁর অনুসৃত আমেদাবাদ পদ্ধতি সবাই গ্রহণ করবে। এর জন্য তিনি কোন তাড়াহুড়ো করতে চান নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর এই আশা পূর্ণ হয় নি। কিন্তু তিনিও নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। ১৯৪০ সালে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রমিকদের উপর কংগ্রেসের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কংগ্রেস আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন দুটি পৃথক খাতে প্রবাহিত হ'য়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সি.এফ.এণ্ড্রুজ, বিপিনচন্দ্র পাল, ভি.ভি.গিরি প্রভৃতি কংগ্রেস নেতা শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও শ্রমিকদের উপর কংগ্রেসের প্রভাব কখনও সে রকম জোরালো ভাবে পড়ে নি। গান্ধীবাদী মতাদর্শ আমেদাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও শ্রমিকদের আকৃষ্ট করে নি। কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ১৯২৮ সালে আমেদাবাদে কোন শিল্প ধর্মঘট হয় নি। সুতরাং গান্ধীর নীতি যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'য়েছিল তাও বলা চলে না। তাছাড়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য গান্ধী যে সব গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার প্রাসঙ্গিকতা সম্ভবতঃ আজও ফুরিয়ে যায় নি।

Scanned with CamScanner